সংগঠিতকরণ
Organizing

৬

একটি সংগঠন বা প্রতিষ্ঠান বহুবিধ ধরনের সম্পর্কের (relationships) সমষ্টি। এসব সম্পর্কের ভেতরে অবস্থান করে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ব্যবস্থাপকদের নেতৃত্বে তাদের সাধারণ লক্ষ্যসমূহ হাসিলের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। এ লক্ষ্যগুলো পরিকল্পনারই ফসল, যা আমরা ৫ম ইউনিটে আলোচনা করেছি। ব্যবস্থাপকেরা যেসব লক্ষ্য নির্ধারণ করেন, সেগুলো সাধারণত সুদূরপ্রসারী ফলাফলসমৃদ্ধ এবং উচ্চাভিলাষ মুখী হয়ে থাকে। ব্যবস্থাপকেরা কামনা করেন যে, তারা সাফল্যের সাথে তাদের লক্ষ্যগুলো অর্জন করতে পারবেন এবং একই সাথে তারা চান যে, তাদের সংগঠন দীর্ঘজীবী হোক অনাগত কাল ধরে বেঁচে থাকুক। তাই ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজন একটি স্থায়িত্বশীল, বোধগম্য কাঠামো যার ভেতরে থেকে তারা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিতভাবে কর্মকাণ্ড চালিয়ে যেতে পারেন। প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সম্পর্ক-কাঠামো (relationships framework) সৃষ্টি তাই ব্যবস্থাপকদের অন্যতম কাজ। সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্পর্ক কাঠামো সৃষ্টি করা হয়। এ ইউনিটে আমরা ব্যবস্থাপকের সংগঠিতকরণ (organizing) কার্য সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ের ওপর আলোচনা করব।

ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ০২ সপ্তাহ

এ ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ - ৬.১: সংগঠিতকরণ: ধারণাগত আলোচনা
পাঠ - ৬.২: সাংগঠনিক কাঠামো ও ডিজাইন
পাঠ - ৬.৩: সাংগঠনিক ডিজাইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন
পাঠ - ৬.৪: প্রচলিত সাংগঠনিক কাঠামো
পাঠ - ৬.৫: বিভাগীকরণ
পাঠ - ৬.৬: ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ
পাঠ - ৬.৭: ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ
পাঠ - ৬.৮: তত্ত্বাবধান পরিসর

কেউ কেউ *Organizing* শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘সংগঠন’ শব্দ ব্যবহার করেন। ব্যাকরণীয় দৃষ্টিকোণ থেকে প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিশব্দ ‘সংগঠিতকরণ’ হওয়া বাঞ্ছনীয়। *Organization* শব্দের অর্থ ‘সংগঠন’। এ বইয়ে আমরা “সংগঠিতকরণ” শব্দটি ব্যবহার করলেও সংগঠন শব্দটিও একই অর্থে ব্যবহার করা হবে।

পাঠ ৬.১ সংগঠিতকরণ: ধারণাগত আলোচনা
Organizing: Conceptual Discussions

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সংগঠিতকরণ কী ও তার প্রকৃতি সম্পর্কে বলতে পারবেন।
- সংগঠিতকরণের ধারণাগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

একটি প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও প্রাপ্তব্য সম্পদের (মানব সম্পদ, ফিজিক্যাল সম্পদ, আর্থিক সম্পদ ইত্যাদি) যথাযথ পরিচালনা ও ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্য এগুলোকে সঠিকভাবে সংগঠিত করা অপরিহার্য। ব্যবস্থাপকীয় কার্য হিসেবে সংগঠিতকরণ-কার্য পরিকল্পন-কার্যের পর পরই শুরু হয়। এ কার্যের সঠিকতা ও নৈপুণ্যের ওপর নির্ভর করে ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার পরবর্তী কার্যগুলো কতটুকু অর্থবহ ও সফল হবে। তাই সংগঠিতকরণ সম্পর্কিত বিভিন্ন ধারণা সম্বন্ধে ব্যবস্থাপকদের ওয়াকিবহাল থাকা প্রয়োজন। এ পাঠে আমরা মূলত, সংগঠিতকরণ কী এবং সংগঠিতকরণের বিভিন্ন ধরনের ধারণার ওপর আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

সংগঠিতকরণ: অর্থ ও প্রকৃতি
Organizing: meaning and nature

যৌক্তিক উপায়ে বিভিন্ন কার্য এবং সম্পদের বিভাগীকরণ বা গ্রুপিং করা হলে তাকে সংগঠিতকরণ বলা হয়। কোনো বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় কাজগুলোকে চিহ্নিত ও বিভক্ত করা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব নির্ধারণের পর তা প্রয়োজন অনুসারে যথাযথ ব্যক্তিদের নিকট অর্পণ করা এবং ব্যক্তিদের মধ্যে সম্পর্কের কাঠামো সৃষ্টি করাই হলো সংগঠিতকরণ বা সংগঠন।

হ্যারল্ড কুঞ্জ প্রমুখের মতে, "সংগঠিতকরণের অর্থ হচ্ছে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কার্যাবলিকে বিভাগীকরণ, প্রত্যেক বিভাগকে একজন ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা এবং তাকে বিভাগীয় কাজ তত্ত্বাবধানের ক্ষমতা প্রদান এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোতে উল্লম্ব ও সমান্তরালভাবে সমন্বয় সাধনের ব্যবস্থাকরণ"। (Organizing is the grouping of activities necessary of attain objectives, the assingnment of each grouping to a manager with authority necessary to supervise it and the provision for coordination horizontally and verrically in the enterprise structure.)

দুই বা ততোধিক ব্যক্তির কর্মকাণ্ডকে সচেতনভাবে সমন্বিত করার ফলে যে সিস্টেমের উদ্ভব হয় তাকে সংগঠন বলা যায়। এ কথা বলেছেন **বার্নার্ড** নামে একজন প্রখ্যাত ব্যবস্থাপনা বিশারদ, যিনি 'The Functions of the Executive' নামে একটি বই লিখে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছেন। অনুরূপভাবে, **এডগার সেইন** (Edgar Schein) নামক স্বনামধন্য সাংগঠনিক মনোবিজ্ঞানী বলেছেন, কতিপয় ব্যক্তির প্রচেষ্টায়, সাধারণ লক্ষ্য, শ্রম বিভাগ ও কর্তৃত্বের স্তর- এ চারটির সমাবেশ ঘটলে একটি সংগঠনের উদ্ভব হতে পারে।

বিভিন্নজনের সংজ্ঞা এবং বাস্তব জীবনে আমাদের অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায় যে, সংগঠিতকরণ হলো একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্পর্ক সৃষ্টি, ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলিকে সনাক্ত করার পর এগুলোর শ্রেণিবদ্ধকরণ বা বিভাগীকরণ, প্রত্যেকের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয় সাধন।

'সংগঠিতকরণ' বা 'সংগঠন' কথাটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ কোনো কিছু সংগঠিত করার অর্থে 'সংগঠন' শব্দটি ব্যবহার করেন। যেমন-একটি শিল্পপ্রতিষ্ঠান বা সমিতি বা ক্লাব সংগঠিত করা। আবার, 'প্রতিষ্ঠান' বোঝানোর জন্যও

এ শব্দটিকে ব্যবহার করা হয়। যেমন- ব্যবসায় সংগঠন, সেবামূলক সংগঠন, সরকারি সংগঠন, বেসরকারি সংগঠন ইত্যাদি। **আরজিরিস** (Argyris) নামে একজন ব্যবস্থাপনাবিদ একটু জটিলতার ছোঁয়াচ এনে বলেছেন, "সংগঠন হলো কোনো ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী সকলের আচরণের সমষ্টি" (All the behaviour of all participants)। এমনিভাবে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হলেও ব্যবস্থাপকদের নিকট সংগঠন মানে হলো- আনুষ্ঠানিক পদ কাঠামো (formalized structures of positions)। যে কোনো প্রতিষ্ঠানে বা সংস্থায় বিভিন্ন পদে যেসব লোক নিয়োজিত থাকেন তাদের পদগুলোর অবস্থান দেখিয়ে সুবিন্যস্ত একটি কাঠামো (Structure) তৈরি করা হয়। এটিই হলো পদ কাঠামো। এ পদ কাঠামোর আলোকেই আনুষ্ঠানিক সংগঠন (formal organization) কথাটি ব্যবহৃত হয়। সংগঠিতকরণ প্রক্রিয়ার ফলাফলই হলো সংগঠন (organization)- নিয়োজিত কর্মীদের সমষ্টি এবং তাদের মধ্যকার সম্পর্কের একটি নেটওয়ার্ক। ব্যবস্থাপনার আলোকে সংগঠনকে প্রক্রিয়া (process) এবং কাঠামো (structure) হিসেবে অভিহিত করা হয়।

সংগঠিতকরণের ধারণাসমূহ

Concepts of organizing

সংগঠিতকরণ সম্পর্কিত মৌলিক ধারণাগুলোকে চিত্র ৬.১ -এ দেখানো হয়েছে। এখানে প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হবে। পরবর্তী পাঠগুলোতে এগুলোর বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে।

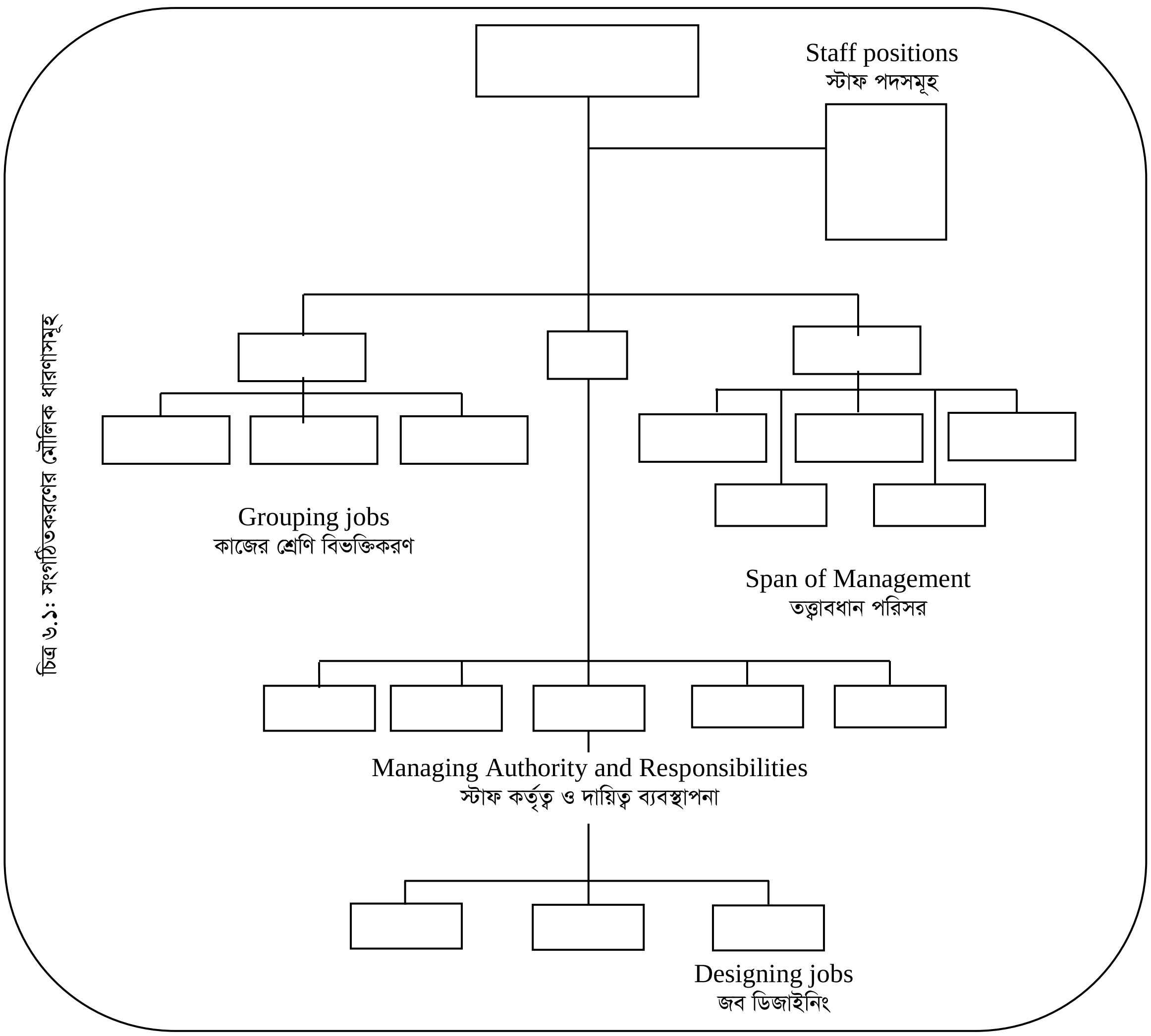

চিত্র ৬.১: সংগঠিতকরণের মৌলিক ধারণাসমূহ

(ক) জব ডিজাইনিং (Job designing): সংগঠিতকরণের মৌলিক উপাদান হলো জব ডিজাইনিং। এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যের বিশেষায়ণের পর্যায় নির্ধারণ করা হয় এবং কাজগুলোকে অর্থবহ উপায়ে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। শ্রেণিবিভক্তকরণের এ প্রক্রিয়া বিভাগীকরণ (departmentalization) নামে পরিচিত। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন ব্যক্তির কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন ও কার্যাবলির তত্ত্বাবধানের জন্য বিভাগীকরণ অপরিহার্য।

(খ) কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব (Authority and responsibility): সংগঠিতকরণের সময় কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সুচারুরূপে নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক ও অধীনস্থদের মধ্যে কর্তৃত্ব অর্পণের (delegation) মাধ্যমে এ কার্য সম্পাদন করা হয়। সমগ্র প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যখন কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব বণ্টন করে দেওয়া হয়, তখন তা বিকেন্দ্রীকরণ (decentralization) নামে অভিহিত হয়।

(গ) ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান পরিসর (Span of mamagement): এটি হলো সংগঠিতকরণ-কার্যের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তত্ত্বাবধান পরিসর মানে, একজন ব্যবস্থাপকের নিকট যতজন অধীনস্থ-কর্মী রিপোর্ট করবে তার সংখ্যা (number of subordinates who report to a manager)।

(ঘ) রৈখিক ও স্টাফ পদ (Line and staff positions): রৈখিক ও স্টাফ পদগুলোর ব্যবস্থাপনার প্রতি ও সংগঠিতকরণের সময় দৃষ্টি রাখতে হয়। প্রত্যক্ষ চেইন-অব-কমান্ডের মধ্যে যেসব পদ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকে, সেগুলো হলো রৈখিক পদ (line positions)। আর, স্টাফ পদ হলো পরামর্শদানমূলক পদ (advisory positions) যেগুলোকে লাইন ব্যবস্থাপকদের সাহায্য করার জন্য সৃষ্টি করা হয়।

সারসংক্ষেপ

সংগঠিতকরণ হলো একটি বিশেষ লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্মিলিত ব্যক্তিবর্গের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্ক ও যোগাযোগ সম্পর্ক সৃষ্টি, ব্যক্তিবর্গের কার্যাবলিকে সনাক্ত করার পর এগুলোর শ্রেণিবদ্ধকরণ বা বিভাগীকরণ, প্রত্যেকের জন্য দায়িত্ব ও কর্তব্য বণ্টন, তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ধারণ এবং লক্ষ্যার্জনের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সমন্বয় সাধন। সংগঠিতকরণের চারটি ধারণা প্রচলিত রয়েছে- জব ডিজাইনিং, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব, ব্যবস্থাপনা তত্ত্বাবধান পরিসর এবং রৈখিক ও স্টাফ পদ। জব ডিজাইনিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কার্যের বিশেষায়ণের পর্যায় নির্ধারণ করা হয় এবং কাজগুলোকে অর্থবহ উপায়ে শ্রেণিবিভক্ত করা হয়। সংগঠিতকরণের সময় কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সুচারুরূপে নির্ধারণ করে দেওয়া প্রয়োজন। ব্যবস্থাপক ও অধীনস্থদের মধ্যে কর্তৃত্ব অর্পণের মাধ্যমে এ কার্য সম্পাদন করা হয়। প্রত্যক্ষ চেইন-অব-কমান্ডের মধ্যে যেসব পদ প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত থাকে, সেগুলো হলো রৈখিক পদ। আর, স্টাফ পদ হলো পরামর্শদানমূলক পদ, যেগুলোকে লাইন ব্যবস্থাপকদের সাহায্য করার জন্য সৃষ্টি করা হয়।

পাঠ ৬.২ সাংগঠনিক কাঠামো ও ডিজাইন
Organizational Structure and Design

উদ্দেশ্য

পাঠ শেষে আপনি-

- সাংগঠনিক কাঠামো কী তা বলতে পারবেন।
- সাংগঠনিক নকশা বা ডিজাইন সম্পর্কে বলতে পারবেন।

একজন ব্যবস্থাপকের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা অপরিহার্য। তাকে জানতে হবে- সাংগঠনিক কাঠামো কত প্রকারের হতে পারে, কোনটি তার প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযোগী এবং কেন উপযোগী, সংগঠন চার্ট কীভাবে তৈরি করতে হয় ইত্যাদি। ব্যবস্থাপকের সংগঠিতকরণ কার্যের সাথে সংগঠনের শ্রেণিবিন্যাস নির্ধারণ, সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সাংগঠনিক ডিজাইন বিষয়ক ব্যাপারগুলোও জড়িত। তাই ব্যবস্থাপকের নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর ওপর সম্যক জ্ঞান থাকা আবশ্যক:

- ***সাংগঠনিক কাঠামো কত প্রকারের হতে পারে:*** বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাঠামো, টেকনিক্যাল দিক এবং সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে পরিস্কার ধারণা থাকলে ব্যবস্থাপকের পক্ষে প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত সাংগঠনিক কাঠামো সহজতর হয়।
- ***চার্ট বা অরগেনোগ্রাম কীভাবে তৈরি করা হয়:*** চার্ট তৈরি করার সময় কী কী বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে হয় ইত্যাদি জানা থাকলে ব্যবস্থাপকেরা তাদের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করার পর তা চার্টের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারেন।
- ***প্রতিষ্ঠানের স্ট্র্যাটেজির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে কীভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় (যা সাংগঠনিক ডিজাইন নামে পরিচিত):*** এ সম্বন্ধে জানা থাকলে সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে ব্যবস্থাপকদেরকে বিপত্তির মুখোমুখি হতে হয় না।

সাংগঠনিক কাঠামোর এ বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে এ পাঠে আমরা সাংগঠনিক কাঠামোর বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করব।

সাংগঠনিক কাঠামো
Organization structure

প্রতিষ্ঠানে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বিভিন্নধর্মী কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন না করা হলে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এরূপ সম্ভাব্য অন্তরায় বিদূরিত করে লক্ষ্যার্জন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যকার সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া অপরিহার্য। তাদের মধ্যে বিরাজমান আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক নিরূপন করার জন্য যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে সাংগঠনিক কাঠামো (Organizational structure) বলা হয়। বস্তুত পক্ষে, সংগঠন কাঠামো প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিবর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকৃতি ও স্বরূপ নির্দেশ করে এবং ব্যবস্থাপনার আঙ্গিক সুস্পষ্ট করে তোলে। প্রতিষ্ঠানে যে সব কর্মী থাকেন তাদের মধ্যে কে কার নিকট জবাবদিহি করবে এবং কে কাকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করবে তা সংগঠন কাঠামো থেকে পরিস্কারভাবে জানা যায়। তাই কেউ কেউ সংগঠন কাঠামোকে ব্যবস্থাপনার 'ইমারত' (edifice) হিসেবে বর্ণনা করেছেন। প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে কীভাবে আনুষ্ঠানিকভাবে বিভক্ত করা হয় এ বং কীভাবে এগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়, তা সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। রবিনস- এর মতে, "An organization structure defines how job tasks are formally divided, grouped and coordinated."

একটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো কীরূপ হবে তা চারটি উপাদান দ্বারা নির্ধারিত হয়। এগুলো হলো- কৌশল, প্রতিষ্ঠানের আকার, প্রযুক্তি ও পরিবেশ। সাংগঠনিক কাঠামোর ডিজাইন দুটি মডেলের মধ্যে যেকোনো একটি মডেলের আলোকে প্রণয়ন করা যেতে পারে। দুটি মডেল হলো- (ক) মেকানিস্টিক মডেল ও (খ) অরগ্যানিক মডেল (এগুলো সম্পর্কে পরবর্তীতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)। কাঠামোগত ডিজাইনের প্রভাব পড়ে কর্মীদের কার্যসম্পাদন ও কর্মসন্তুষ্টির ওপর। পুরো বিষয়টিকে চিত্রের মাধ্যমে দেখানো যায় (চিত্র ৬.২)।

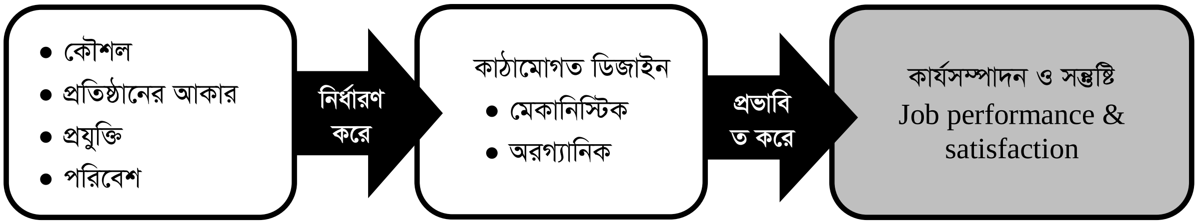

চিত্র ৬.২: সাংগঠনিক কাঠামো: নির্ধারক ও ফলাফল

এমন কোনো উত্তম কাঠামো নেই যা যেকোনো বা সকল পরিস্থিতির জন্য উত্তম। পরিবেশ ও পরিস্থিতি পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রায়শই কাঠামোরও পরিবর্তন করতে হয়। সঠিক পছন্দ নির্বাচনের জন্য একজন ব্যবস্থাপকের জানতে হবে সংগঠন কত ধরনের এবং কাঠামো কীভাবে কাজ করে। বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আমরা পাঠ ৬.৪- এ বিস্তারিত আলোচনা করব। আসুন প্রথমে জেনে নেই আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক সংগঠন সম্পর্কে।

<u>আনুষ্ঠানিক সংগঠন (Formal organization)</u>: বস্তুতপক্ষে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই এক একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকেরা আনুষ্ঠানিক সংগঠনের রূপরেখো প্রণয়ন করেন। এ কাঠামোতে অবস্থানরত শীর্ষস্থানীয়রা প্রতিষ্ঠানের ভিশন, মিশন, কৌশলিক পরিকল্পনা, পলিসি ও কার্যপদ্ধতি ইত্যাদি নির্ধারণ করার পাশাপাশি সাংগঠনিক কাঠামো কীরূপ হবে তাও নির্ধারণ করেন। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যেই আনুষ্ঠানিক সংগঠন প্রতিবিম্বিত হয়। এ ধরনের কাঠামোতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নির্ধারণ ও সংজ্ঞায়িত করে দেওয়া হয় :

ক	কর্মীদের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক
খ	কে কার নিকট জবাবদিহি করবে তার রূপরেখা
গ	আনুষ্ঠানিক যোগাযোগ চ্যানেল কীরূপ হবে তৎসম্পর্কিত নিয়মাবলি
ঘ	কর্তৃত্বের স্তর।

আনুষ্ঠানিক সংগঠনে সবাইকে নির্ধারিত দায়িত্ব অবধারিতভাবে পালন করতে হয়।

<u>অনানুষ্ঠানিক সংগঠন (Informal organization)</u>: প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে শৃঙ্খলা ও কর্তৃত্বের স্তর সৃষ্টির জন্য আনুষ্ঠানিক সংগঠনের অন্য কোনো বিকল্প নেই। তবে আনুষ্ঠানিক সংগঠনের ভেতরেও অনেক না বলা কথা থেকে যায়, যা সাংগঠনিক কাঠামো থেকে অনুধাবন করা যায় না। আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের বাইরেও কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা পারস্পারিক সম্পর্কের সৃষ্টি করে কথাবার্তা বলে, তথ্য বিনিময় করে, বন্ধুত্ব পাতায়। তাই আনুষ্ঠানিক সংগঠনের আওতার মধ্যে থেকেই মানবীয় আচরণ বিবেচনা করতে হবে। বিভিন্ন স্বার্থের কারণে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে। এরূপ দল মনে মনে গড়ে তোলা হয়- লিখিতভাবে এর প্রকাশ থাকে না। এরূপ দল অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের জন্ম দেয়। আনুষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতর থেকেই অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়। প্রত্যেক কর্মচারী দৈনন্দিন কার্যাবলি সম্পাদনকালে বিভিন্ন কর্মীর সাথে মেশার সময়, মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়, চা খাবার অবসরে কিংবা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাদের প্রতিষ্ঠান সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রকার তথ্য আদানপ্রদান করতে পারে। যখন অনেক লোক একই স্থানে একত্রে মিলে মিশে কাজ করে তখন সেখানে স্বাভাবিক নিয়মেই অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কের সৃষ্টি হয়। অনানুষ্ঠানিক সম্পর্কই হলো অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের ভিত্তি।

এখানে উল্লেখ্য, আনুষ্ঠানিক কাঠামো হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের অফিসিয়াল কাঠামো, যেখানে সকল কার্যসম্পাদন করা হয় আনুষ্ঠানিক নিয়মে। অন্যদিকে, অনানুষ্ঠানিক কাঠামো হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের প্রতিচ্ছবি।

সাংগঠনিক নকশা বা ডিজাইন

Organizational design

সাংগঠনিক ডিজাইন হলো এমন ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে ব্যবস্থাপকগণ প্রতিষ্ঠানের কৌশলের (strategy) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটি সাংগঠনিক কাঠামো নির্ধারণ করে থাকেন। অবশ্য সংশ্লিষ্ট কৌশলটি কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা যে পরিবেশে বাস্তবায়ন করেন, তার সাথেও সাংগঠনিক কাঠামো সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া অপরিহার্য। ফলে দেখা যাচ্ছে, সাংগঠনিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকেরা একইসাথে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন: প্রতিষ্ঠানের ভেতরের অবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরের পরিবেশগত অবস্থা। তবে স্মরণ রাখা দরকার যে, যেহেতু কৌশল এবং পরিবেশ উভয়ই সময়ের সাথে পরিবর্তিত হতে পারে, সেহেতু সাংগঠনিক ডিজাইনও একটি চলমান প্রক্রিয়া হিসেবে বিরাজমান থাকবে। তাছাড়াও সাংগঠনিক এ কাঠামোর পরিবর্তন 'চেষ্টা-ভ্রান্তি' (trial and error) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংগঠিত হয়।

পরবর্তী পাঠে সাংগঠনিক ডিজাইন প্রক্রিয়ায় কীভাবে বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়ন করা হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। প্রথমে আমরা সাংগঠনিক ডিজাইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন তুলে ধরব; এরপরে সংগঠন চার্ট নিয়ে আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানে অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিভিন্ন কাজে নিয়োজিত থাকে। এসব কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ভিন্নধর্মী কার্যাবলির মধ্যে সমন্বয় সাধন না করা হলে প্রতিষ্ঠানের মূল লক্ষ্য অর্জনের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হয়। এরূপ সম্ভাব্য অন্তরায় বিদূরিত করে লক্ষ্যার্জন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্যকার সম্পর্ক সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া অপরিহার্য। তাদের মধ্যে বিরাজমান আন্ত:ব্যক্তিক সম্পর্ক নিরূপণ করার জন্য যে হাতিয়ার ব্যবহার করা হয় তাকে সাংগঠনিক কাঠামো বলা হয়। একটি প্রতিষ্ঠানে দুধরনের সংগঠন দেখতে পাওয়া যায়। আনুষ্ঠানিক সংগঠন এবং অনানুষ্ঠানিক সংগঠন। বস্তুত পক্ষে প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানই এক একটি আনুষ্ঠানিক সংগঠন। প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় প্রশাসক বা ব্যবস্থাপকেরা আনুষ্ঠানিক সংগঠনের রূপরেখো প্রণয়ন করেন। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যেই আনুষ্ঠানিক সংগঠন প্রতিবিম্বিত হয়। বিভিন্ন স্বার্থের কারণে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনানুষ্ঠানিক দল গঠন করে। এরূপ দল মনে মনে গড়ে তোলা হয়- লিখিতভাবে এর প্রকাশ থাকে না। এরূপ দল অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের জন্ম দেয়। আনুষ্ঠানিক কাঠামোর ভেতর থেকেই অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের সৃষ্টি হয়।

পাঠ ৬.৩ সাংগঠনিক ডিজাইনের ঐতিহাসিক বিবর্তন
Historical Evolution of Organizational Design

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- সাংগঠনিক ডিজাইনের বিবর্তনের ইতিহাস বলতে পারবেন।

আমরা আগেও দেখেছি, সাংগঠনিক ডিজাইনের ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকেরা একইসাথে দুটি বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেন: প্রতিষ্ঠানের ভেতরের অবস্থা এবং প্রতিষ্ঠানের বাইরের পরিবেশগত অবস্থা। যদিও সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ পরিবর্তিত হয় ঠিক তেমনি সংগঠনের কৌশলেও পরিবর্তন আসে। সাংগঠনিক ডিজাইন পরিকল্পনের সময় এ বিষয়টি মাথায় রেখে ব্যবস্থাপকদের নকশা প্রণয়ন করতে হয়। বর্তমানে আমরা যে কয়টি সাংগঠনিক ডিজাইন দেখতে পাই তা উত্তরোত্তর একদিনে হয়নি। এর বিবর্তনের একটি উজ্জ্বল ইতিহাস রয়েছে। এ পাঠে আমরা সাংগঠনিক ডিজাইনের এ ঐতিহাসিক বিবর্তন নিয়ে আলোচনা করব।

সাংগঠনিক ডিজাইনের বিবর্তন
Evolution of organizational design

পরিবেশগত কারণে মূলত বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক ডিজাইনের উদ্ভব হয়েছে। কারণ যাই থাকুক, 'সর্বোত্তম পন্থা' খোঁজার দৌড়ে কেউ সফল হতে পারেনি। এখনো ব্যবস্থাপকেরা তাদের ব্যবসায়িক পরিবেশ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা ও কাঠামো বিশ্লেষণ করে প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক ডিজাইন তৈরি করেন। আসুন জেনে নেই সাংগঠনিক ডিজাইনের সমৃদ্ধ ইতিহাসটি।

১. ধ্রুপদি এ্যাপ্রোচ (Classical approach): প্রথমদিকে ব্যবস্থপক এবং গ্রন্থকারগণ সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকার পরিবেশে ব্যবহারযোগ্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের জন্য 'সর্বোত্তম পন্থা' খুঁজে বেড়াতেন। এরাই ধ্রুপদি এ্যাপ্রোচের স্রষ্টা। যারা এ এ্যাপ্রোচ প্রসারে অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন ম্যাক্স ওয়েবার (Max Weber), ফ্রেডারিক টেইলর (Frederick Taylor) এবং হেনরী ফেয়ল (Henri Fayol)। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে, কার্যকর ও নিপুণ প্রতিষ্ঠানে থাকবে একটি স্তরভিত্তিক কাঠামো, যেখানে কর্মীরা কর্তব্যপরায়ণতা ও নির্ধারিত নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হবে। পূর্ণাঙ্গ একটি প্রতিষ্ঠানে ধীরে ধীরে গড়ে ওঠবে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্যঃ কাজের বিশেষায়ণ, মেধাভিত্তিক নিয়োগ, পদোন্নয়নের ব্যবস্থা, কাজ কর্মের নৈমিত্তিকতা (routinisation of activities) এবং একটি যৌক্তিক, অব্যক্তিক সাংগঠনিক পরিবেশ। ম্যাক্স ওয়েবার এ অবস্থার নাম দিয়েছেন আমলাতন্ত্র (bureaucracy)। ওয়েবার আমলাতন্ত্রের প্রশংসা করেছেন এ জন্য যে, আমলাতন্ত্রে সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়, আদেশের ঐক্য (chain of command) থাকে, সামর্থ্যের ভিত্তিতে লোকজনের পদোন্নতি দেওয়া হয়, কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট থাকে, যার ফলে কর্মীদের কর্মসম্পাদান মূল্যায়ন করে যথোপযুক্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়। ওয়েবার ও অন্যান্য ক্লাসিক্যাল লেখকগণ এমন এক সময়ে সাংগঠনিক ডিজাইনের এ বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছিলেন, যখন সরকারের সিভিল সার্ভিসে এরূপ ডিজাইন অনুসরণ করা হতো। বর্তমানে যদিও আমলাতন্ত্রের প্রতি একটা নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে (মনে করা হয় আমলাতন্ত্র হচ্ছে এমন কাঠামো যা ধীরগতি সম্পন্ন, অদক্ষ এবং যেখানে সৃজনশীল কর্মকাণ্ডের কোনো অবকাশ নেই); একসময় কিন্তু এটি ভালোভাবেই কাজ করেছে।

২. কর্ম-প্রযুক্তি এ্যাপ্রোচ (Task-technology approach): ১৯৬০- এর দশকে এ এ্যাপ্রোচের উদ্ভব। সাংগঠনিক ডিজাইনের এ এ্যাপ্রোচে ভিন্ন রকমের কয়েকটি অভ্যন্তরীণ চলককে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্ম প্রযুক্তি বলতে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য তৈরির সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন প্রযুক্তিকে বোঝানো হয়। ১৯৬০- এ দশকের মাঝামাঝি সময়ে জোয়ান উডওয়ার্ড নামে একজন মহিলা গবেষক ও তাঁর সাথীরা গবেষণা করে দেখলেন যে, প্রতিষ্ঠানের কর্ম প্রযুক্তি এর কাঠামো ও

সফলতাকে প্রভাবিত করে। তারা তিনটি উপসংহার টানলেন– প্রথমত, প্রযুক্তি যত বেশি জটিল হবে ব্যবস্থাপকের সংখ্যা ততো বেশি হবে। অর্থাৎ জটিল প্রযুক্তি ব্যবহারকারী প্রতিষ্ঠানের কাঠামো হবে খাড়া (tall) ধরনের এবং এতে অধিক তত্ত্বাবধান ও সমর্থনের প্রয়োজন হবে। দ্বিতীয়ত, গণ-উৎপাদনে উত্তরণ ঘটার পর প্রথম স্তরের ব্যবস্থাপকদের তত্ত্বাবধান পরিসর বেড়ে যাবে। তৃতীয়ত, প্রযুক্তির জটিলতা বৃদ্ধি পেলে করণিক ও প্রশাসনিক স্টাফের সংখ্যা বেড়ে যাবে। কারণ বিশেষায়িত কাজে মনোনিবেশ করার লক্ষ্যে ব্যবস্থাপকেরা রুটিন বা নৈমিত্তিক কাজগুলোর জন্য অধিকমাত্রায় স্টাফের ওপর নির্ভর করবে।

৩. পরিবেশগত এ্যাপ্রোচ (Enviroment approach): ষাট এর দশকেই যখন উডওয়ার্ড ও তাঁর সঙ্গীরা গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই টম বার্নাস (Tom Burnas) ও জি.এম. স্টাকার (G.M. Stalker) সাংগঠনিক ডিজাইনের পরিবেশগত এ্যাপ্রোচ উদ্ভাবন করেন। এক্ষেত্রে সাংগঠনিক ডিজাইন প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ বিবেচনা করা হয়। তারা দুপ্রকারের সাংগঠনিক ডিজাইন প্রবর্তন করেন- (ক) মেকানিস্টিক ডিজাইন ও (খ) অরগ্যানিক ডিজাইন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর গবেষণা চালিয়ে তারা উপসংহার টানলেন যে, স্থিতিশীল পরিবেশ মেকানিস্টিক ডিজাইন এবং অস্থিতিশীল পরিবেশে অরগ্যানিক ডিজাইন সর্বাধিক উপযোগী। পরিবর্তনমূলক বা পরিবর্তনশীল পরিবেশে দুটির মধ্যে সমন্বয় সাধন করা শ্রেয়তর। এখানে এ দুটি মডেলের বর্ণনা দেওয়া হলো–

মেকানিস্টিক সাংগঠনিক ডিজাইন
Mechanistic Organizational Design

স্থিতিশীল পরিবেশে মেকানিস্টিক ডিজাইন অধিকতর ফলপ্রসূ। এরূপ ডিজাইনের ক্ষেত্রে কাজগুলোকে বিশেষায়িত করা হয়, ব্যাপকভাবে বিভাগীয়করণের আশ্রয় নেওয়া হয়। আনুষ্ঠানিকতার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়, সীমিত তথ্য নেটওয়ার্ক ব্যবহার করা এবং ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয়। আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর সাথে এর মিল রয়েছে। চিত্র ৬.৩ দেখুন।

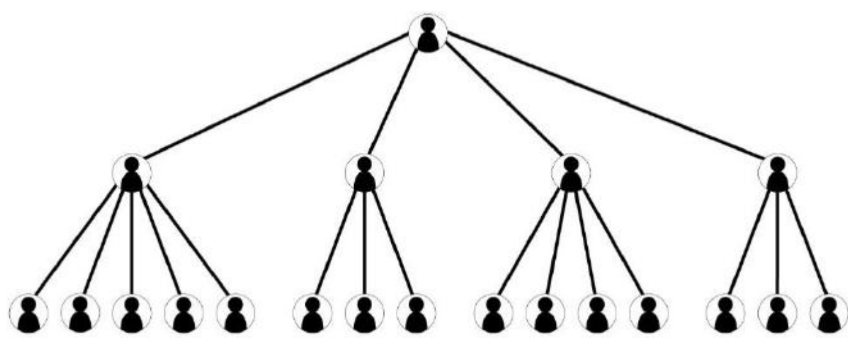

চিত্র ৬.৩: মেকানিস্টিক মডেল

অরগ্যানিক সাংগঠনিক ডিজাইন
Organic Organizational Design

১৯৬০-এর দশকের প্রথম দিকে দুজন বৃটিশ গবেষক অরগ্যানিক ডিজাইন উদ্ভাবন করেন। উদ্ভাবকদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল ব্যবস্থাপকদের প্রতিষ্ঠানের পরিবেশের সাথে সঙ্গতি রেখে সংগঠন কাঠামো প্রণয়নে সহায়তা করা। যদি দেখা যায়, পরিবেশ বিরূপ, বাজারে প্রতিযোগিতা প্রবল এবং পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাতিষ্ঠানিক কর্মকাণ্ডে দ্রুত ও প্রতিনিয়ত সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজন হয়, তখন অরগ্যানিক ডিজাইন খুবই ফলপ্রদ হয়। এরূপ ডিজাইনে যোগাযোগ ব্যবস্থা অবাধ থাকে, বিশেষায়ণের ওপর গুরুত্ব কম থাকে, আনুগত্যের স্থলে সাংগঠনিক অঙ্গীকারের ওপর অধিক প্রাধান্য দেওয়া হয় এবং আনুষ্ঠানিকতা ন্যূনতম পর্যায়ে রাখা হয়। চিত্র ৬.৪ দেখুন।

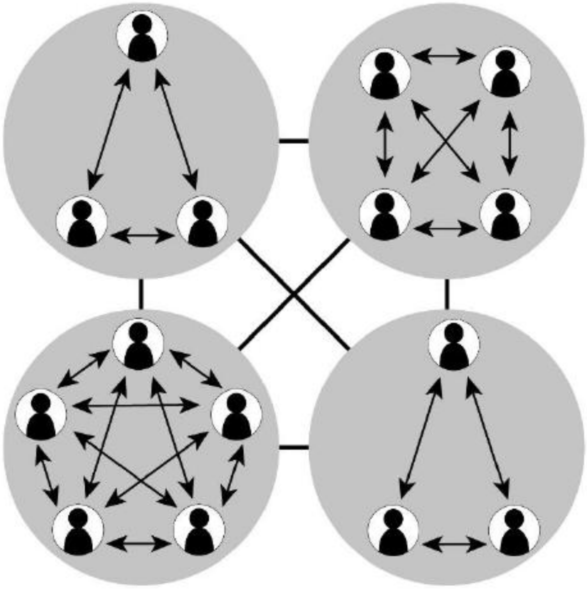

চিত্র ৬.৪: অরগ্যানিক মডেল

সুবিধাসমূহ:

- আন্তঃকার্যভিত্তিক দল
- অবাধ তথ্য প্রবাহ
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ
- নিম্নমাত্রার আনুষ্ঠানিকতা

৪. ডাউনসাইজিং (Downsizing): সাম্প্রতিককালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক প্রতিষ্ঠানে (বিশেষ করে ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে) একটি নতুন ধরনের সাংগঠনিক ডিজাইন প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে যা তাদের অভ্যন্তরীণ পরিবেশগত অবস্থার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ 'পুনর্গঠন' (restructuring) নামে পরিচিত। আজকাল পুনর্গঠনের মাধ্যমে সাধারণত প্রতিষ্ঠানের কর্মী সংখ্যা হ্রাস করা হয়। তাই এ প্রক্রিয়াকে ডাউনসাইজিং নামে অভিহিত করা হয়। ডাউনসাইজিং-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আকার (size) ছোটো করা হয়, যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান পরিসর বড়ো হয় এবং সাংগঠনিক কাঠামোও প্রশস্ত (flat) হয়। তবে এরূপ ডিজাইনের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বহু লোকের চাকরি চলে যায় বলে কর্মীদের মধ্যে ডাউনসাইজিং-এর আতঙ্কে মনোবল হ্রাস পায় এবং তাদের কর্মদক্ষতার ওপর এর বিরূপ প্রভাব পড়ে।

সারসংক্ষেপ

পরিবেশগত কারণে মূলত বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক ডিজাইনের উদ্ভব হয়েছে। প্রথমদিকে ব্যবস্থাপক এবং গ্রন্থকারগণ সর্বক্ষেত্রে সর্বপ্রকার পরিবেশে ব্যবহারযোগ্য একটি সাংগঠনিক কাঠামো প্রণয়নের জন্য 'সর্বোত্তম পন্থা' খুঁজে বেড়াতেন। এরা ধ্রুপদি এ্যাপ্রোচের স্রষ্টা। তাঁদের মতে, কার্যকর ও নিপুণ প্রতিষ্ঠানে থাকবে একটি স্তরভিত্তিক কাঠামো, যেখানে কর্মীরা কর্তব্যপরায়ণতা ও নির্ধারিত নিয়মকানুন দ্বারা পরিচালিত হবে। সাংগঠনিক ডিজাইনের কর্ম-প্রযুক্তি এ্যাপ্রোচে ভিন্ন রকমের কয়েকটি অভ্যন্তরীণ চলককে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কর্ম-প্রযুক্তি বলতে বিভিন্ন প্রকারের পণ্য তৈরির সাথে সংযুক্ত বিভিন্ন প্রকারের উৎপাদন প্রযুক্তিকে বোঝানো হয়। এক্ষেত্রে সাংগঠনিক ডিজাইন প্রক্রিয়ায় প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশ বিবেচনা করা হয়। তারা দুপ্রকারের সাংগঠনিক ডিজাইন প্রবর্তন করেন- (ক) মেকানিস্টিক ডিজাইন ও (খ) অরগ্যানিক ডিজাইন। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ওপর গবেষণা চালিয়ে তারা উপসংহার টানলেন যে, স্থিতিশীল পরিবেশ মেকানিস্টিক ডিজাইন এবং অস্থিতিশীল পরিবেশে অরগ্যানিক ডিজাইন সর্বাধিক উপযোগী। ডাউনসাইজিং-এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠানের আকার ছোটো করা হয়, যার ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তত্ত্বাবধান পরিসর বড়ো হয় এবং সাংগঠনিক কাঠামোও প্রশস্ত হয়।

পাঠ ৬.৪ প্রচলিত সাংগঠনিক কাঠামো
Traditional Organizational Structures

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- সংগঠন চার্ট কী তা বলতে পারবেন।
- বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে বলতে পারবেন।

সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো দেখতে পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে এ কাঠামোগুলো প্রচলিত। প্রতিষ্ঠান তার প্রয়োজন ও কৌশল অনুযায়ী তার কাঠামো নির্ধারণ করে। এ কাঠামোগুলো কেমন? এ নিয়ে আলোচনা করার আগে সংগঠন চার্ট কী তা জেনে নিলে সাংগঠনিক কাঠামো বোঝতে সুবিধা হবে। একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের অফিসিয়াল পদসমূহ এবং কর্তৃত্বের আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের চিত্রকে **সংগঠন চার্ট** বলে। প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে বিভিন্ন কর্মকর্তা কর্মীদের অবস্থান কোথায়; কে কোন অবস্থানে থেকে কী দায়িত্ব পালন করবেন; কার কাছে তাদের কাজের জন্য জবাবদিহি করবেন এবং একজনের সাথে অন্যদের কর্তৃত্বের সম্পর্ক কীরূপ ইত্যাদি প্রদর্শন করে যে চিত্র তৈরি করা হয়, তা সংগঠন চার্ট নামে পরিচিত। একজন গ্রন্থকার সংগঠন চার্টকে "A visual display of an organization structural skeleton" নামে অভিহিত করেছেন। আসলে সংগঠন চার্ট হলো কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের পারস্পারিক সম্পর্কের একটি অঙ্কিত রূপ। চিত্রাঙ্কন করে এ সম্পর্কের ধরন প্রকাশ করা হয়। সংগঠন চার্ট দেখে সাবাই বোঝতে পারে– কোন কর্মকর্তা কোন পদ অলংকৃত করেছেন, কোন পদের সরাসরি ওপরে বা সরাসরি নিচে অন্য কোন পদের অবস্থান, কে কার অধীনস্থ বা যোগাযোগের ধারা কীরূপ ইত্যাদি। এবার আসুন জেনে নেই বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে।

বিভিন্ন প্রকার সাংগঠনিক কাঠামো
Different types of organizational structure

একটি প্রতিষ্ঠানের বহুবিধ কারণে চার্ট থাকা প্রয়োজন যা ওপরে আলোচনা করা হয়েছে। এ ধরনের চার্ট শুধু সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কেই সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টি করে না, এতে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের রূপ প্রতিফলিত হয় বলে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনার প্রতিচ্ছায়াও সুপরিস্ফুট হয়ে ওঠে। এককে কাঠামোর এককে ধরনের চার্ট হয়ে থাকে। সাধারণত ছয় ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো দেখা যায়:

১. সরলরৈখিক কাঠামো
২. সরলরৈখিক স্টাফ কাঠামো
৩. কার্যভিত্তিক কাঠামো
৪. বিভাগীয় কাঠামো
৫. মেট্রিক্স কাঠামো
৬. দল কাঠামো

আসুন এ কাঠামোগুলো সম্পর্কে জেনে নেই।

⊙ **সরলরৈখিক কাঠামো (Line structure):** এরূপ কাঠামোতে উচ্চ পর্যায়ের নিকট থেকে নিম্নস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট কর্তৃত্ব প্রবাহিত হয়। উপরস্থ কর্মকর্তা 'চেইন অব কমান্ড' বা আদেশের শৃঙ্খল অনুসরণ করেন এবং অধীনস্থদের ওপর নির্দেশ প্রদান করে। অধীনস্থ কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও 'চেইন অব কমান্ড' অনুযায়ী ওপরের স্তরে তথ্য প্রবাহিত করেন। এ ধরনের কাঠামোতে অধীনস্থদের ওপর উচ্চ পদস্থদের সরাসরি কর্তৃত্ব থাকে। প্রত্যেক কর্মীই জানেন,

কার নিকট থেকে তিনি নির্দেশ পাবেন এবং কার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। যেসব ব্যবস্থাপকের সরল রৈখিক বা লাইন কর্তৃত্ব থাকে তাদেরকে 'লাইন ম্যানেজার' বা লাইন অফিসার বলা হয়।

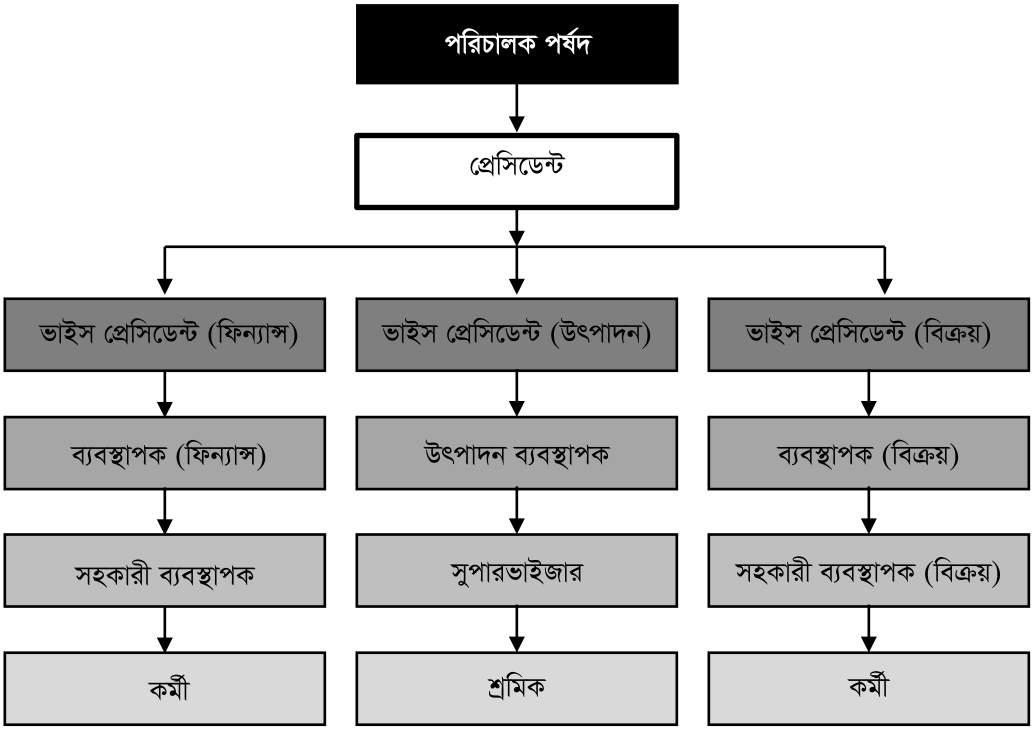

চিত্র ৬.৫: সরলরৈখিক সংগঠন চার্ট

⊙ **সরলরৈখিক ও স্টাফ কাঠামো (Line and staff structure):** সরলরৈখিক কর্তৃত্বের সাথে কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে স্টাফদের সেবা সংযুক্ত করা হলে 'সরলরৈখিক ও স্টাফ কাঠামো'-এর উদ্ভব হয়। লাইন ম্যানেজারদেরকে পরামর্শ দান ও সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়োগ করা হয়– তারা স্টাফ নামে পরিচিত। স্টাফদের সরলরৈখিক কর্তৃত্ব থাকে না; তারা শুধু ব্যবস্থাপকদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে থাকেন– যাতে ব্যবস্থাপকরা সুষ্ঠুভাবে নিজ নিজ কর্তব্য পালন করতে পারেন। এটি সাধারণত 'লাইন ও স্টাফ' সংগঠন কাঠামো নামে বেশি পরিচিত। এরূপ কাঠামো যখন চার্টের আকারে প্রকাশ করা হয়, তখন চার্টের লাইন নির্বাহীদের সাথে সাথে স্টাফ বা বিশেষজ্ঞদের অবস্থানও দেখানো হয়। ৬.৬ নং চিত্রে একটি উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের লাইন ও স্টাফ সংগঠনের চার্ট দেখানো হয়েছে। এতে দেখা যাচ্ছে যে, প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা 'প্রেসিডেন্ট' কে বিশেষজ্ঞ সেবা দিয়ে সহায়তা করার জন্য দুটি স্টাফ পথ সৃষ্টি করা হয়েছে; একটি 'বিশেষ সহকারী' পদ এবং আরেকটি 'আইন উপদেষ্টা'র পদ। চার্টে উল্লেখিত প্রেসিডেন্ট, তিনজন ভাইস-পেসিডেন্ট ও কারখানার ব্যবস্থাপকের পদগুলো হলো লাইন-নির্বাহী পদ। বিপণন বিভাগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট এর সাথে সংযুক্ত 'গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপক' এর পদটি একটি স্টাফ-পদ (Staff position), লাইন-পদ (Line-position) নয়। পক্ষান্তরে, অর্থ বিভগের ভাইস-প্রেসিডেন্টের রয়েছে একজন 'নির্বাহী সচিব'। এখানে গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যবস্থাপক এবং নির্বহী সচিবের পদ স্টাফ শ্রেণিভুক্ত। সাংগঠনিক কাঠামোতে লাইন নির্বাহী ও স্টাফের মধ্যকার পার্থক্য নির্ধারণ করা হয় সম্পর্ক (relationships) দিয়ে, বিভাগীয় কাজের বৈশিষ্ট্য দিয়ে নয়।

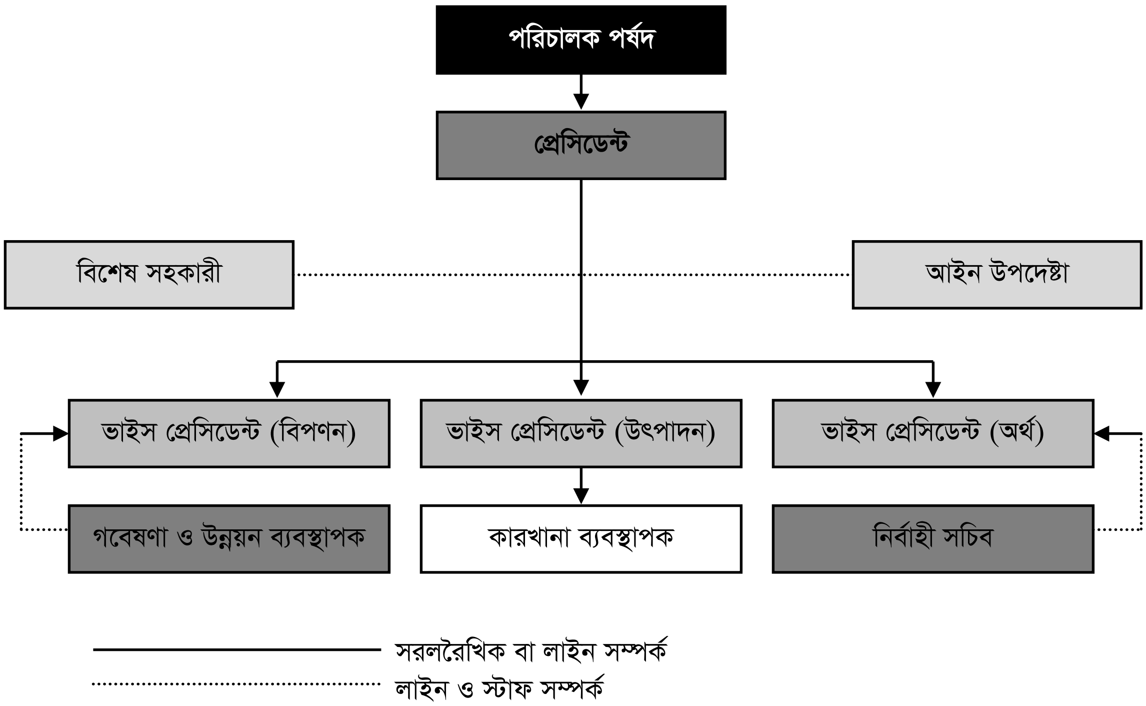

চিত্র ৬.৬: সরলরৈখিক ও স্টাফ সংগঠন

⊙ **কার্যভিত্তিক কাঠামো (Functional structure):** কার্যভিত্তিক সংগঠনে স্টাফ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা উদেষ্টা হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন ছাড়াও ব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে যেসব কাজ একই ধরনের সেগুলোকে একজন নির্বাহীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। একজন নির্বাহী একটি বিভাগের অধীনে সবগুলো সমরূপ কার্যকে একত্রিত করে সেগুলো সম্পাদন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। সুতরাং বলা যায়, কার্যভিত্তিক কর্তৃত্বের (Functional authority) মাধ্যমেই কার্যভিত্তিক সংগঠনের উদ্ভব হয়। মূলত, এরূপ সংগঠনে যা করা হয় তাহলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগের লাইন ব্যবস্থাপকের কতিপয় কার্যাবলি তাদেরকে সম্পাদন করতে না দিয়ে একটি আলাদা বিভাগ খুলে সে বিভাগের স্টাফ বিশেষজ্ঞ বা ব্যবস্থাপকের নিকট উক্ত কার্যাবলি সম্পাদানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। সাধারণত এমন ধরনের কাজগুলো আলাদা করা হয় যেগুলো লাইন ব্যবস্থাপকের পক্ষে বিশেষায়িত জ্ঞানের অভাবে কিংবা কর্মদক্ষতার সীমাবদ্ধতার কারণে সঠিকভাবে সম্পন্ন বিবেচিত হয়।

কার্যভিত্তিক সংগঠন চার্ট (Functional organization chart)

কার্যভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামো অনুসারে একজন লাইন-ম্যানেজারের কতিপয় কর্তৃত্ব ও কার্যাবলি আরেকজন ম্যানেজারের নিকট অর্পণ করা হয়। এ কর্তৃত্ব কিছু কার্যে সাথে সংশ্লিষ্ট হওয়ায় তাকে কার্যভিত্তিক কর্তৃত্ব (functional authority) বলা হয়। চিত্র ৬.৭- এ প্রদর্শিত সংগঠন চার্টটিতে কার্যভিত্তিক কর্তৃত্বের বহি:প্রকাশ ঘটেছে। এখানে প্রত্যেক ভাইস-প্রেসিডেন্ট একটি প্রধান সাংগঠনিক কার্যের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

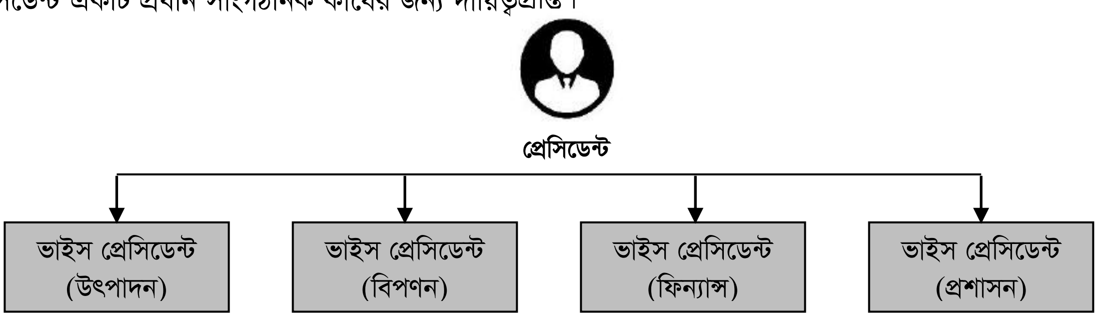

চিত্র ৬.৭: কার্যভিত্তিক সংগঠন চার্ট

কার্যভিত্তিক সংগঠন কাঠামো বা চার্টে প্রতিষ্ঠানের কাজগুলোকে এদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয় এবং আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কার্য বণ্টনের সময় শ্রমবিভাজন ও বিশেষায়ণ নীতির প্রতি লক্ষ রাখা হয়। কাজগুলোকে বিভিন্ন শ্রেণিতে এমনভাবে বিভক্ত করা হয়, যাতে এক শ্রেণি একই প্রকৃতির হয়। এগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত হওয়ায়ও বাঞ্ছনীয়।

⊙ **বিভাগীয় কাঠামো (Divisional structure):** বিভাগীয় সাংগঠনিক কাঠামোকে অনেকে 'পণ্য বা বাজারভিত্তিক' সাংগঠনিক কাঠামো নামেও অভিহিত করে থাকেন। একটি পণ্য বা পরস্পর সম্পর্কিত পণ্যাবলির উৎপাদন ও বিপণনে জড়িত সবাইকে একটি ওয়ার্ক ইউনিটের আওতায় এনে এরূপ কাঠামো তৈরি করা হয়। কম্পিউটার জগতের স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠান হিউলেট-প্যাকার্ড (Hewlett-Packard) এবং গাড়ি প্রস্তুতকারী কোম্পানি "জেনারেল মোটরস" বিভাগীয় কাঠামো অনুসরণ করে। বহুপণ্যবিশিষ্ট বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলো সাধারণত বিভাগীয় সাংগঠনিক কাঠামো ব্যবহার করে থাকে। চিত্র ৬.৮- এ বিভাগীয় কাঠামো চার্টের আকারে দেখানো হয়েছে।

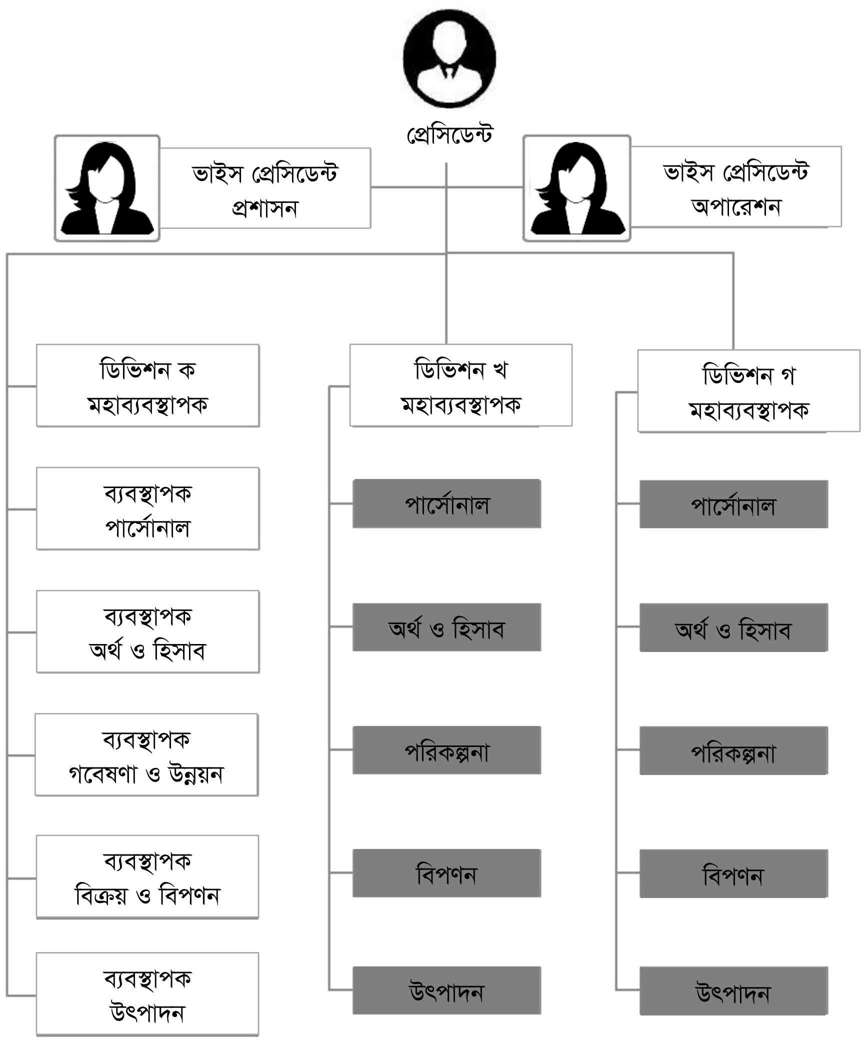

চিত্র ৬.৮: বিভাগীয় সাংগঠনিক কাঠামো

⊙ মেট্রিক্স কাঠামো (Matrix structure): প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান কার্যভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর বিভাগীয় কাঠামো অধিস্থাপনের (Superimpose) মাধ্যমে মেট্রিক্স সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা হয়। এরূপ কাঠামোর মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান যেমন একদিকে কার্যভিত্তিক সংগঠনের নৈপুণ্য বজায় রাখতে পারে, ঠিক তেমনি পণ্যভিত্তিক সংগঠনের সুবিধাগুলোও ভোগ করতে পারে। চিত্র ৬.৯- এ মেট্রিক্স কাঠামোর নমুনা দেওয়া হয়েছে। চিত্রে দেখা যাচ্ছে, প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে– এগুলো কার্যভিত্তিক বিভাগ। প্রত্যেটি বিভাগের দায়িত্বে রয়েছেন একজন ভাইস-প্রেসিডেন্ট। চিত্রের বাম দিকে রয়েছে তিনজন প্রকল্প ব্যবস্থাপকের অবস্থান। এদের প্রত্যেকের স্থান একেকটি পণ্যভিত্তিক (product-based) বিভাগের প্রধান কর্মকর্তার অনুরূপ। মেট্রিক্সের মধ্যে প্রত্যেক কর্মকর্তাই একেকটি প্রকল্পের সাথে জড়িত যা কার্যভিত্তিক বিভাগুলোর সাথে সম্পৃক্ত। ফলে মেট্রিক্সের অন্তর্ভুক্ত প্রত্যেক কর্মীই দুটি (বা ততোধিক) বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকেন। তিনি একই সময়ে দুজন (বা ততোধিক) কর্মকর্তার নিকট নিজ কাজের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন।

একাধিক প্রকল্প হাতে নিয়েছে এমন ধরনের কোম্পানিগুলো মেট্রিক্স সংগঠন ব্যবহার করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, কম্পিউটার প্রস্তুতকারক কোম্পানি NCR ও প্রুডেন্সিয়াল ইনসিওরেন্স কোম্পানির নাম উল্লেখ করা যায়।

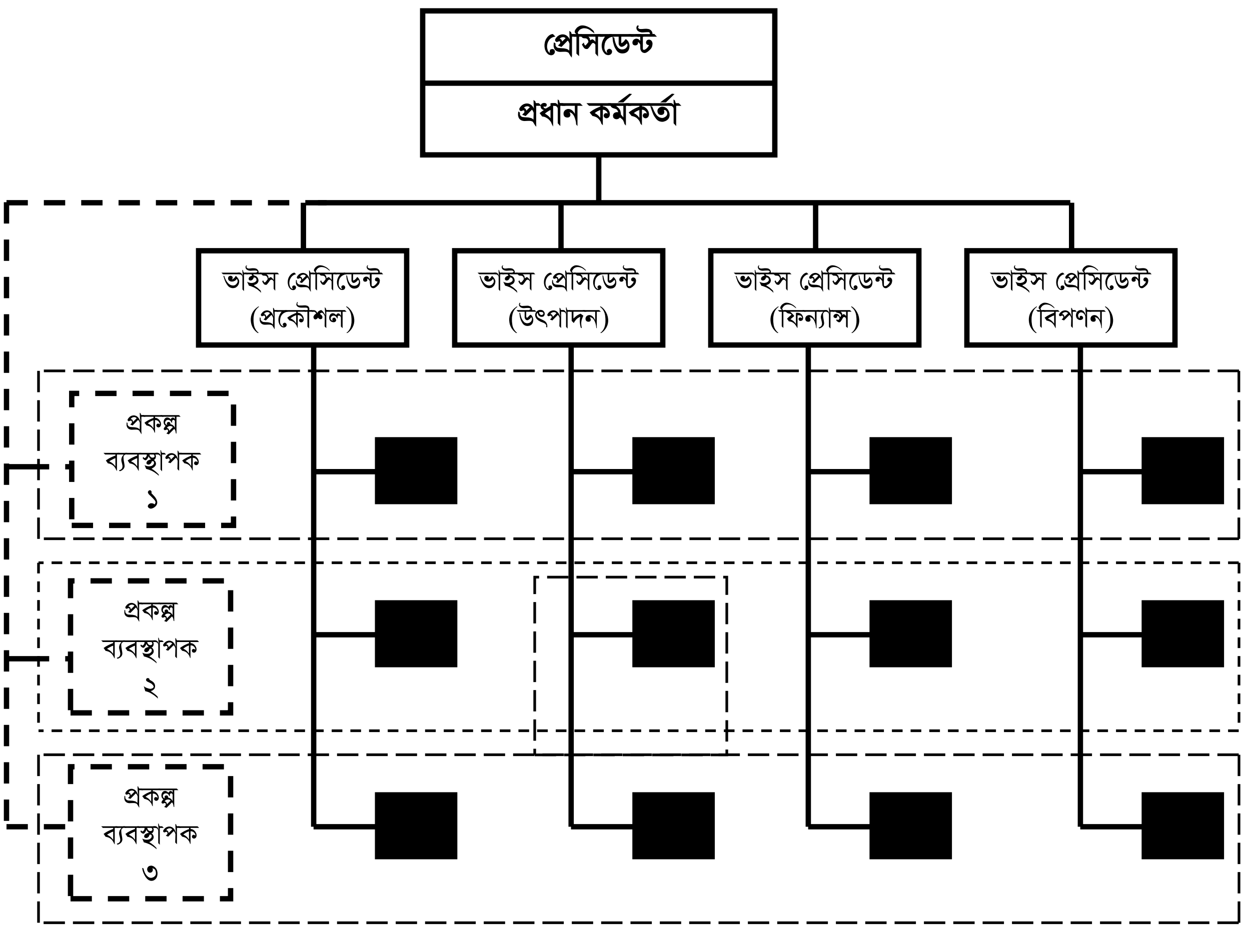

চিত্র ৬.৯: মেট্রিক্স সাংগঠনিক কাঠামো

⊙ দল কাঠামো (Team structure): বিশেষ কোনো প্রশাসনিক কাজ সম্পাদন করার জন্য সাধারণত একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি দল গঠন করা হয়। ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদানের জন্য দলের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করে। দলের সদস্যবৃন্দ একত্রিত হয়ে আলাপ-আলোচনা এবং প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

দলের সিদ্ধান্ত বা সুপারিশ কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করতে পারেন, নাও করতে পারেন। কোনো বিশেষ ধরনের প্রশাসনিক বিষয়ে কিংবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য কয়েকজন ব্যক্তির একটি দল গঠন করা হলে তাকে দল কাঠামো বলা হয়। একে অনেকেই কমিটি কাঠামো হিসেবেও আখ্যায়িত করে থাকে। দলের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালন করার জন্য পরিকল্পনা মাফিক সময়ে সময়ে সদস্যরা সভায় বসে, প্রয়োজনীয় তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখে, আলোচনার মাধ্যমে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় এবং সিদ্ধান্ত মোতাবেক কার্যক্রম গ্রহণ করে।

সাধারণত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে কোনো সমস্যা দেখা দিলে, কোনো ব্যাপারে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করার প্রয়োজন দেখা দিলে কয়েকজন দায়িত্ববান কর্মীর সমন্বয়ে একটি দল গঠন করে দেওয়া হয় এবং দলের ওপর সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ভার অর্পণ করা হয়। দল কী কাজ করবে, তাদের কাজের ধরন কেমন হবে এবং কাজ শেষ হয়ে যাবার পর তাদের কাজের প্রতিবেদন কার নিকট পেশ করতে হবে ইত্যাদি সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ দেওয়া থাকে। এ পথ নির্দেশকে বলা হয় দলের 'টামর্স অব রেফারেন্স'। সচরাচর উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দল গঠন করে এবং 'টার্মস অব রেফারেন্স' প্রণয়ন করে দেয়, যার বাইরে দল কোনো কিছু করতে পারে না। দল আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক উভয় প্রকার হতে পারে। আনুষ্ঠানিক দল সংগঠনের অংশ হিসেবে নির্ধারিত দায়িত্ব পালন করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং স্থায়ীভাবে নিযুক্ত থাকে। আর অনানুষ্ঠানিক দল অস্থায়ীভাবে বিশেষ কোনো সমস্যার সমাধান কিংবা বিশেষ কোনো কর্মসম্পাদন করার জন্য গঠিত হয়। কাজ শেষ হয়ে যাবার সাথে সাথে এরূপ কমিটির অস্তিত্ব লোপ পায়।

সংগঠিতকরণের খুঁটিনাটি বিষয়গুলো জানা হলো। এখন আমাদের জানা দরকার বিভাগীকরণ কাকে বলে? এ বিষয়টি সংগঠিতকরণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। পরবর্তী পাঠে আমরা এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

সারা বিশ্বে বিভিন্ন ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো দেখতে পাওয়া যায়। যুগ যুগ ধরে এ কাঠামোগুলো প্রচলিত। সাধারণত ছয় ধরনের সাংগঠনিক কাঠামো দেখা যায়: সরলরৈখিক কাঠামো, সরলরৈখিক স্টাফ কাঠামো, কার্যভিত্তিক কাঠামো, বিভাগীয় কাঠামো, মেট্রিক্স কাঠামো এবং দল কাঠামো। সরলরৈখিক কাঠামোতে উচ্চ পর্যায়ের নিকট থেকে নিম্নস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিকট কর্তৃত্ব প্রবাহিত হয়। সরল রৈখিক কর্তৃত্বের সাথে কর্মকাণ্ড পরিচালনার সুবিধার্থে স্টাফদের সেবা সংযুক্ত করা হলে 'সরলরৈখিক ও স্টাফ কাঠামো'-এর উদ্ভব হয়। কার্যভিত্তিক সংগঠনে স্টাফ বা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিরা উপদেষ্টা হিসেবে তাদের ভূমিকা পালন ছাড়াও ব্যবস্থাপক হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলির মধ্যে যেসব কাজ একই ধরনের সেগুলোকে একজন নির্বাহীর অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বিভাগীয় সাংগঠনিক কাঠামোকে অনেকে 'পণ্য বা বাজারভিত্তিক' সাংগঠনিক কাঠামো নামেও অভিহিত করে থাকেন। একটি পণ্য বা পরস্পর সম্পর্কিত পণ্যাবলির উৎপাদন ও বিপণনে জড়িত সবাইকে একটি ওয়ার্ক ইউনিটের আওতায় এনে এরূপ কাঠামো তৈরি করা হয়। প্রতিষ্ঠানে বিদ্যমান কার্যভিত্তিক সাংগঠনিক কাঠামোর ওপর বিভাগীয় কাঠামো অধিস্থাপনের মাধ্যমে মেট্রিক্স সাংগঠনিক কাঠামো তৈরি করা হয়। কোনো বিশেষ ধরনের প্রশাসনিক বিষয়ে কিংবা অন্য কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে আলাপ-আলোচনা ও বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ অথবা কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য কয়েকজন ব্যক্তির একটি দল গঠন করা হলে তাকে দল কাঠামো বলা হয়।

পাঠ ৬.৫ বিভাগীকরণ
Departmentalization

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বিভাগীকরণ কী তা বলতে করতে পারবেন।
- বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

সাধারণত প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজ (jobs) বা কার্যাবলিকে বিভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করার পূর্বে 'জব ডিজাইন' (job design)-এর কাজ সম্পন্ন করা হয়। জব ডিজাইনের মানে হলো, প্রত্যেক পদে অধিষ্ঠিত কর্মীরা কী কী পদ্ধতিতে কী কী কাজ করবে তা নির্ধারণ করে দেওয়া। জব ডিজাইনের পর সংগঠিতকরণ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ হলো কাজগুলোকে যৌক্তিক উপায়ে বিভিন্ন বিভাগের আওতায় নিয়ে আসা, যা গ্রুপিং (grouping) নামে সমধিক পরিচিত। এ পর্যায়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সঠিকভাবে বিভক্তিকৃত কাজগুলোর ফলে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে সমন্বিত করা সহজতর হয়। কাজসমূহকে গ্রুপিং করার প্রক্রিয়া বিভাগীকরণ (departmentation/departmentalization) নামে পরিচিত। সংগঠন কাঠামোকে শক্তিশালী করার জন্য বিভাগীকরণ প্রয়োজন। এ পাঠে আপনি বিভাগীকরণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জানতে পারবেন। একজন ব্যবস্থাপককে কেন বিভাগীকরণের প্রতি গুরুত্ব দিতে হয় এবং তিনি বিভাগীকরণের জন্য কী কী পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারেন ইত্যাদি বিষয় এখানে আলোচনা করা হবে। এ পাঠটি আপনার ভালোভাবে জানা থাকলে আপনি পরবর্তীতে কর্তৃত্ব অর্পণ, কেন্দ্রীকরণ বিকেন্দ্রীকরণ ও তত্ত্বাবধান পরিসর সম্পর্কিত আলোচনা সহজে বোঝতে পারবেন। তবে, এর আগে আমাদের "সমন্বয়সাধন" সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে জেনে নিতে হবে।

সমন্বয়সাধন ও বিভাগীকরণ
Coordination and Departmentalization

সমন্বয়সাধন: সমন্বয়সাধনকে সংগঠিতকরণ-কার্যের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচনা করা হয়। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ সমন্বয়সাধনকে ব্যবস্থাপনার একটি আলাদা কার্য হিসেবে বিবেচনা করেন। যে যেভাবেই বিবেচনা করুন না কেন, প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানেই সমন্বয়সাধন খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। বিশেষত বৃহৎ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজগুলোকে কয়েকটি বিভাগের অধীনে নিয়ে আসার পর স্বাভাবিকভাবেই আলাদা আলাদা বিভাগের সৃষ্টি হয়। এসব বিভাগ গঠিত হওয়ার পর থেকেই এগুলোর একের কার্যাবলির সাথে অপরের কার্যাবলির একটি যোগসূত্র স্থাপন করা খুবই জরুরি। কারণ সবগুলো বিভাগের কাজকর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠানের সার্বিক লক্ষ্য অর্জনের জন্যই পরিচালিত হয়। তাই প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জন সহজতর করার জন্য এক বিভাগের কার্যাবলির সাথে অন্যান্য বিভাগের কার্যাবলির সমন্বয়সাধন একান্ত দরকার।

ব্যবস্থাপনার কার্যাবলি একটি আরেকটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তেমনি ব্যবস্থাপনার একজন ব্যক্তির কাজও আরেকজন ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত। একক ও অভিন্ন লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন সকলের কার্যাবলি সম্পাদিত হতে থাকে তখন তাদের মধ্যে একটি সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সম্পর্কের কারণে প্রত্যেকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কার্যসম্পাদন করে পরবর্তী জনের কাছে প্রেরণ করে। এরূপ একটি সম্পর্ককে ব্যবস্থাপনা শাস্ত্রে সমন্বয়সাধন বলা হয়। ব্যবস্থাপনার বিভিন্ন পর্যায়ে একজনের কাজ যেহেতু আরেকজনের কার্যের ওপর নির্ভরশীল, কাজেই প্রত্যেকের মধ্যে একটি কার্যগত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। এ ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থাকেই সমন্বয় বলা হয়ে থাকে। এ আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, সমন্বয়সাধন হলো আসলে প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রক্রিয়া।

বিভাগীকরণ: একটি প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে বৃহৎ ব্যবসায়িক সংগঠনে বহু প্রকারের কার্যসম্পাদিত হয়। কোনো কোনো কার্য উৎপাদনের সাথে সম্পর্কিত, কোনোটি পণ্য ক্রয় কিংবা বিক্রয়ের সাথে আবার কোনোটি হিসাবরক্ষণ বা আর্থিক ব্যবস্থাপনার সাথে জড়িত। প্রতিষ্ঠানের কিছু কাজ আছে যেগুলোকে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত কাজ হিসেবে বিবেচনা করা যায়।

আবার কিছু কাজকে যোগাযোগ বা নির্দেশনা অথবা নিয়ন্ত্রণমূলক কাজ হিসেবে অভিহিত করা যায়। এমনিভাবে প্রাতিষ্ঠানিক অঙ্গনে সম্পাদিত কার্যাবলিকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিশ্লেষণ করা যায়। এ কাজগুলোকে যদি সমজাতীয় বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আলাদা করে ফেলা হয়, তাহলে বেশ কয়েকটি সমজাতীয় কার্য-শ্রেণির সৃষ্টি হবে। এরপর প্রত্যেকটা কার্য-শ্রেণিকে এক একটি বিভাগের অধীনে ন্যস্ত করা যায়। এভাবে প্রতিষ্ঠানের কার্যাবলিকে সমজাতীয়তার ভিত্তিতে ভিন্ন বিভাগে বিভক্ত করা হলে পুরো প্রক্রিয়াটি বিভাগীকরণ (কেউ কেউ বিভাগীয়করণ শব্দটিও ব্যবহার করে থাকেন) নামে পরিচিত হয়। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিভাগীকরণ হলো একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সমজাতীয় কার্যাবলিকে আলাদা আলাদা বিভাগের আওতাধীনে আনয়ন করা হয়। একটি উদাহরণ দিলে বিভাগীকরণের বিষয়টি আরও স্পষ্ট হবে। ধরুন, একটি উৎপাদনমুখী প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পণ্যসামগ্রী কেনা হয়। কাচাঁমাল, যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, আসবাবপত্র, রাসায়নিক সামগ্রী, মনোহারী সামগ্রী ইত্যাদি এ প্রতিষ্ঠানের ক্রয়যোগ্য সামগ্রীর অন্তর্ভুক্ত। ধরে নেওয়া যায় যে, কাচাঁমাল ও যন্ত্রপাতি/যন্ত্রাংশ/রাসায়নিক সামগ্রী উৎপাদন বিভাগে ব্যবহৃত হবে; সুতরাং এগুলো ক্রয় করবে প্রশাসন বিভাগ। অথবা এমনটিও হতে পারে যে, প্রত্যেক বিভাগই নিজের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র ও মনোহারী দ্রব্য নিজেরাই ক্রয় করবে। এভাবে ক্রয় করা হলে মিতব্যয়িতা অর্জন সম্ভব হবে না- প্রত্যেক বিভাগই কম পরিমাণে পণ্য ক্রয় করবে বিধায় উচ্চহারে বিক্রেতার নিকট থেকে কমিশন পাবে না; আলাদাভাবে কেনাকাটা করতে গিয়ে বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অনেক সময়ও নষ্ট হবে। এমতাবস্থায় যদি ক্রয় সংক্রান্ত সমস্ত কাজগুলোকে 'ক্রয় বিভাগ' নাম দিয়ে ভিন্ন একটি বিভাগের অধীনে নিয়ে আসা হয়, তাহলে প্রতিষ্ঠানের জন্য এটি হবে মঙ্গলজনক। অনুরূপভাবে, বিক্রয় সংক্রান্ত কাজগুলোকে বিক্রয় বিভাগের অধীনে নিয়ে আসা যায়। এক একটি বিভাগের অধীনে একই শ্রেণির কাজগুলোকে বিন্যস্ত করাই হলো বিভাগীকরণ-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়।

বিভাগীকরণ কেন করা হয় (Why is departmentalization done)

বিভাগীকরণের মূল উদ্দেশ্য হলো একই শ্রেণির কাজকে একটি বিভাগের অধীনে রেখে কার্যক্রমে শৃংখলা আনয়ন করা এবং বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়বদ্ধ করা। প্রত্যেকটি কাজে অধিকতর নৈপুণ্য অর্জনেও বিভাগীকরণ সহায়তা করে। বিভাগীকরণ শ্রম-বিভাজন (division of labour) নীতির বাস্তবায়ন করে; এক একটি কাজ দক্ষ বিশেষজ্ঞের ওপর ন্যস্ত করা যায়। অল্প খরচে সমন্বয় সাধনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হয়। বিভাগীকরণের মাধ্যমে গঠিত বিভাগগুলো নিজ নিজ কাজে স্বয়ংসম্পূর্ণ থাকে এবং স্বায়ত্তশাসনের সুবিধা ভোগ করে।

বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি

Different ways of departmentalization

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এ পদ্ধতিগুলোকে আমরা ছয়টি ভাগে বিভক্ত করে আলোচনা করতে পারি। পদ্ধতিগুলো হলো:

১. পণ্যভিত্তিক বিভাগীকরণ
২. ক্রেতাভিত্তিক বিভাগীকরণ
৩. অঞ্চল বা স্থানভিত্তিক বিভাগীকরণ
৪. প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ
৫. প্রতিষ্ঠানের কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ
৬. ব্যবস্থাপকের কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ

আসুন বিভাগীকরণের এ পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে জেনে নেই।

(১) পণ্যভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by product): যেসব প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন প্রকার পণ্য তৈরি করা হয় অথবা বিক্রয় করা হয়, সেখানে এক একটি পণ্যের জন্য আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, মনে করুন, ''আলিফ লায়লা শিল্পগোষ্ঠী'' ঔষধ, প্রসাধনী সামগ্রী এবং ডিটারজেন্ট পাউডার উৎপাদন করে। যেহেতু তিনটি সামগ্রীই ভিন্ন প্রকৃতির, সেহেতু কোম্পানি প্রত্যেকটি পণ্যের জন্য আলাদা বিভাগ গঠন করেছে; ঔষধ বিভাগ, প্রসাধনী বিভাগ এবং ডিটারজেন্ট বিভাগ।

(২) ক্রেতাভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by customer): পণ্যের ক্রেতাদের বৈশিষ্ট্য অনুসারে ক্রেতাদেরকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে ক্রেতাভিত্তিক বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। উৎপাদনমুখী সংগঠনে ক্রেতাদের ধরন অনুযায়ী আলাদা বিভাগ খোলা যায়। যেমন-ডিলারদের জন্য 'ডিলার বিভাগ', পাইকারি ক্রেতাদের জন্য 'পাইকারি বিক্রয় বিভাগ' এবং খুচরা ক্রেতাদের জন্য 'খুচরা বিক্রয় বিভাগ' ইত্যাদি। সাধারণ বিপণীতে গ্রাহকদের ধরন অনুযায়ী 'মহিলা বিভাগ', 'পুরুষ বিভাগ', 'শিশু বিভাগ' ইত্যাদি বিভাগ সৃষ্টি করা যায়। কোনো বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে অবস্থিত ব্যাংক তাদের একাউন্ট হোল্ডারদের সুবিধার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ রাখতে পারে: শিক্ষক-একাউন্টহোল্ডার, ছাত্র-একাউন্টহোল্ডার ও ব্যবসায়ী-একাউন্টহোল্ডারদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ রাখা যেতে পারে।

(৩) অঞ্চল বা স্থানভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by territory): অঞ্চলভিত্তিক বিভাগীকরণের ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠানের বিক্রয় (বা সেবা) এলাকাকে কয়েকটি অঞ্চলে বা জোনে (Zone) বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক অঞ্চলকে একজন অঞ্চল-ব্যবস্থাপকের অধীনে ন্যস্ত করা হয়। বিভিন্ন এলাকার জন্য বিশেষ ধরনের সেবা বা সুযোগ-সুবিধা প্রদানের প্রয়োজন হলে সাধারণত এরূপ বিভাগীকরণ করা হয়। বাংলাদেশে একটি বৃহৎ প্রতিষ্ঠান প্রয়োজন হলে সরকার কর্তৃক গঠিত প্রশাসনিক বিভাগগুলোর ভিত্তিতে ৬টি আঞ্চলিক বিভাগ গঠন করতে পারে। বিভাগীকরণ জেলা বা থানাভিত্তিক হতে পারে।

(৪) প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by process): উৎপাদনমুখী শিল্প প্রতিষ্ঠানে পণ্য উৎপাদনের সাথে জড়িত বিভিন্ন প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হলে তা প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ নামে পরিচিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, পাটকল ও বস্ত্রকলে প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ অনুসরণ করা হয়। যেসব শিল্পে কাঁচামাল কয়েকটি প্রক্রিয়া পার হয়ে চূড়ান্ত পণ্যে পরিণত হয় সেখানে প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ প্রায় অপরিহার্য। প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণের প্রধান সুবিধা হলো- পণ্য উৎপাদনকালে প্রত্যেক প্রক্রিয়া-বিভাগের ব্যবস্থাপক তার বিভাগের দায়িত্বে যে কাজটুকু করতে হয় তা নিষ্ঠার সাথে করার চেষ্টা করেন, যাতে পরবর্তী বিভাগে/প্রক্রিয়ায় যাওয়ার পর কেউ কোনো খুঁত না ধরতে পারে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের ক্ষেত্রে প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ অপরিহার্য।

(৫) প্রতিষ্ঠানের কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by organizational functions): প্রায় সকল প্রতিষ্ঠানেই প্রাতিষ্ঠানিক কার্যসমূহের ভিত্তিতে বিভাগীকরণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন কাজের জন্য, যেমন-ক্রয়, বিক্রয়, উৎপাদন, গুদামজাতকরণ, হিসাবরক্ষণ, প্রশাসন, গণসংযোগ ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ খোলা হয়। প্রতিষ্ঠানের কার্যের সমজাতীয়তার ভিত্তিতে বিভাগ সৃষ্টি করা হয় বলে তাকে কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ বলে।

(৬) ব্যবস্থাপকের কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ (Departmentalization by managerial functions): ব্যবস্থাপকেরা যেসব কার্যাবলি সম্পাদন করেন সেগুলোর ওপর ভিত্তি করেও বিভাগীকরণ করা যায়। এরূপ বিভাগীকরণ পরিকল্পনা, সংগঠন, স্টাফিং, নির্দেশনা, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যবস্থাপকীয় কার্যের জন্য আলাদা আলাদা বিভাগ সৃষ্টি করা হয়। তবে এরূপ বিভাগীকরণ পদ্ধতি খুব কমই ব্যবহার করা হয়। কারণ, এতে বিভিন্ন প্রাতিষ্ঠানিক কাজের সাথে সঠিকভাবে সংগতি রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে।

বিভিন্ন বিষয়াদি বিবেচনা করে এবং প্রয়োজন অনুসারে প্রতিষ্ঠান বিভাগীকরণ করে থাকে। বিভাগীকরণ করার পর প্রতিষ্ঠানকে মাথা ঘামাতে হয় কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা নিয়ে। সঠিক সময়ে সঠিকভাবে কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা অর্পণ করা না হলে পরিকল্পনা বাস্তবায়ন কঠিন হয়ে পড়ে। পরবর্তী পাঠে আমরা আলোচনা করব ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ নিয়ে।

সারসংক্ষেপ

সমন্বয়সাধন হলো প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন বিভাগে কর্মরত ব্যক্তিদের কাজের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের প্রক্রিয়া। বিভাগীকরণ হলো একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া, যার মাধ্যমে একটি প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের সমজাতীয় কার্যাবলিকে আলাদা আলাদা বিভাগের আওতাধীনে আনয়ন করা হয়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বিভাগীকরণের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেমন- পণ্যভিত্তিক বিভাগীকরণ, ক্রেতাভিত্তিক বিভাগীকরণ, অঞ্চলভিত্তিক বিভাগীকরণ, প্রক্রিয়াভিত্তিক বিভাগীকরণ, কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ।

পাঠ ৬.৬ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পণ
Power and Authority Delegation

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- ক্ষমতা কী তা বলতে পারবেন।
- ক্ষমতার উৎস বা ভিত্তিগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্তৃত্ব কী তা বলতে পারবেন।
- কর্তৃত্বের বিভিন্ন তত্ত্বগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।
- কর্তৃত্ব অর্পণ বলতে কী বোঝায় তা বলতে পারবেন।

পাঠ ৬.৪- এ আমরা সাংগঠনিক কাঠামো সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি তা থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, সাংগঠনিক কাঠামো প্রতিষ্ঠানের ভেতরে কর্মরত বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যকার সম্পর্কের একটি সুস্পষ্ট, যৌক্তিক ও স্থায়ী প্যাটার্ন সৃষ্টি করে, যার ভেতরে থেকে ব্যবস্থাপক ও কর্মীরা প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য প্রচেষ্টা চালায়। তবে কাঠামো কাঠামোই, এটি নিজে নিজে চলে না। এ কাঠামো কার্যকর করার জন্য প্রয়োজন কতিপয় সুনির্দিষ্ট নিয়মাবলি। কর্মীরা নিয়মাবলি অনুসরণ করেই কাঠামোকে অর্থবহ করে তোলে। ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামোতে যে সব ব্যক্তির সমাহার, তাদেরকে পরিচালিত করার জন্য ব্যবস্থাপকেরা তাদের 'ক্ষমতা' (power) ও 'কর্তৃত্ব' (authority)- এর বলে বলীয়ান হয়ে বিভিন্ন নিয়মাবলি নির্ধারণ ও প্রয়োগ করেন। ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব পরস্পর গভীরভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ব্যবস্থাপকেরা কতটা কার্যকরভাবে তাদের কর্তৃত্ব ব্যবহার করতে পারবেন, তা আংশিকভাবে নির্ভর করে তারা কতটুকু ক্ষমতার ব্যবহার সম্বন্ধে জ্ঞাত তার ওপর। এ 'ক্ষমতা' হলো অন্যদেরকে প্রভাবিত করার সামর্থ্য। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব কীভাবে বণ্টন করা হবে, তা একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠিতকরণ সিদ্ধান্ত। প্রতিষ্ঠানের কৌশলিক পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য যা যা করা অপরিহার্য, তার সবকিছু ব্যবস্থাপকেরা সর্বদা করে ওঠতে পারেন না। তাই তাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়, কতটুকু কর্তৃত্ব তারা অধস্তন ব্যবস্থাপক বা নন-ব্যবস্থাপকদের কাছে অর্পণ (delegate) করবেন। অন্যের সাথে ক্ষমতা ভাগাভাগির সাথে কর্তৃত্ব অর্পণ জড়িত। এ পাঠে আমরা 'ক্ষমতা' ও 'কর্তৃত্ব' এ দুটি বিষয় নিয়ে আলাদাভাবে আলোচনা করব।[১]

ক্ষমতা কী
What is power

অন্য লোকের ওপর প্রভাব খাটানোর প্রতিপত্তিকে ক্ষমতা (power) বলা হয়। অন্যভাবে বলা যায়, ক্ষমতা এমন এক ধরনের শক্তি যা থাকার কারণে জনাব আবেদিন জনাব রহমান- এর আচরণকে এমনভাবে প্রভাবিত করতে পারে যার ফলে জনাব রহমান জনাব আবেদিন- এর ইচ্ছামত কোনো কাজ সম্পাদন করে থাকে। সোজা কথায়, কোনো ব্যক্তি বা দলের মনোভাব বা আচরণকে প্রভাবিত করার শক্তিই হলো ক্ষমতা। **স্টোনার**- এর ভাষায়, "Power is the ability to exert influence on other people." **হ্যারল্ড কুঞ্জ** প্রমুখ বলেন: "Power is the ability of individuals or groups to induce or influence the beliefs or actions of other persons or groups."

---

[১] এ পাঠটি রচনাকালে লেখক কর্তৃক রচিত *সাংগঠনিক আচরণ* গ্রন্থের সহায়তা নেওয়া হয়েছে যা ওপেন স্কুল, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

যেখানেই বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেখানেই ক্ষমতার বিষয়টি জড়িত। প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্যবস্থাপকেরা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করেন। এ ক্ষমতার বলেই তারা কর্মীদেরকে প্রভাবিত করেন এবং তাদের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে সক্ষম হন।

ক্ষমতার উৎস বা ভিত্তি

Sources or bases of power

কোথা থেকে ক্ষমতা আসে? কোনো ব্যক্তি বা দল অন্যের ওপর যে প্রভাব বিস্তার করে, সে প্রভাবের অধিকারী তারা কীভাবে হয়? এ প্রশ্নগুলোর জবাব খুঁজে পেয়েছেন দুজন আমেরিকান গবেষক। তাঁরা হলেন জন ফ্রেঞ্চ ও বার্ট্রাম র‍্যাভেন (John French and Bertram Raven)। তাঁরা ক্ষমতার পাঁচটি উৎস বা ভিত্তি চিহ্নিত করেছেন:

১. জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা (Coercive power): জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা ভীতি নির্ভর। একজন ব্যবস্থাপক যখন কোনো কর্মী বা অধীনস্থ ব্যক্তির ওপর কাজ করানো বা কোনো কাজ করা থেকে বিরত থাকার জন্য শক্তি প্রয়োগ করেন, তখন বলা যায় যে, তিনি জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা প্রয়োগ করছেন। এ ধরনের শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কর্মীরা ভীত হয়ে আদেশ পালন করেন। আদেশ পালনে ব্যর্থ হলে যদি ব্যবস্থাপক চাকরিচ্যুতির কিংবা পদোন্নতি স্থগিত রাখার ভয় দেখান, তখন প্রয়োগকৃত ক্ষমতা জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা হিসেবে চিহ্নিত হবে।

যত প্রকার ক্ষমতা আছে তন্মধ্যে অন্যকে আঘাত বা ক্ষতিগ্রস্ত করার ক্ষমতার সবচেয়ে বেশি প্রয়োগ সবচেয়ে বেশি নিন্দিতও বটে। এরূপ ক্ষমতার দাপট নিয়ন্ত্রণ করাও কঠিন।

২. পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা (Reward power): কর্মী বা অনুসারীদেরকে বিভিন্ন প্রকার পুরস্কার দিতে পারা বা না পারার ক্ষমতাকে পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের ভেতরে যেসব 'পুরস্কার' দেওয়া যায় সেগুলো হলো বেতন বৃদ্ধি, ইনক্রিমেন্ট, পদোন্নতি, ভালো কাজের স্বীকৃতি, কর্মীকে বৈচিত্র্যমূলক কাজের দায়িত্ব প্রদান ইত্যাদি। একজন ব্যবস্থাপক যত বেশি সংখ্যক পুরস্কার নিজের নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে পারেন এবং সেগুলো কর্মীদের কাছে যত বেশি গুরুত্বপূর্ণ মনে হবে, সে ব্যবস্থাপকের তত বেশি পুরস্কার প্রদান ক্ষমতা রয়েছে।

৩. আইনানুগ ক্ষমতা (Legitimate power): একজন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে যে ক্ষমতা পেয়ে থাকেন, তাকেই বলা হয় আইনানুগ ক্ষমতা। এ ক্ষমতারই আরেক নাম কর্তৃত্ব (authority)। সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে বিভিন্ন কর্মীদের পদগুলোর বিন্যাসের মধ্যেই আইনানুগ বা আনুষ্ঠানিক ক্ষমতার উৎস নিহিত। প্রত্যেক ব্যবস্থাপকেরই অধীনস্থ কর্মীদের ওপর আইনানুগ ক্ষমতা থাকে। তবে মনে রাখতে হবে শুধুমাত্র আইনানুগ ক্ষমতা থাকলেই একজন ব্যবস্থাপক প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারে না। নেতা হওয়ার জন্য আরও গুণ থাকা দরকার।

৪. বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা (Expert power): নিজের ব্যক্তিগত জ্ঞান ও বিশেষজ্ঞতাই হলো বিশেষজ্ঞ ক্ষমতার ভিত্তি। অধস্তন কর্মীরা জানে না বা কম জানে এমন ধরনের জ্ঞান বা দক্ষতা যদি ব্যবস্থাপকের থাকে, তাহলে বলা যায় যে তিনি বিশেষজ্ঞ ক্ষমতার অধিকারী। আমাদেরক ডাক্তার যখন একটি বিশেষ ঔষধ খাওয়াসহ কিছু নিয়মকানুন মেনে চলতে বলেন, তখন আমরা ধওে নেই যে, ডাক্তারের বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা আছে।

৫. মোহনীয় ক্ষমতা (Referent power): যারা নেতা নন, তাদের চেয়ে আলাদা বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত হন যেসব নেতারা, তারা এরূপ হতে পারেন মোহনীয় ক্ষমতার কারণেই। একজন ব্যক্তির আচরণের মোহনীয়তা (charisma) এবং অনুকরণীয় ব্যক্তিত্ব মোহনীয় ক্ষমতা সৃষ্টি করে। একজন যুবক খুব জনপ্রিয় কোনো গায়কের মতো পোশাক পরিধান করে বা কোনো চিত্রনায়কের চুলের স্টাইল অনুকরণ করে, তখন বলা যায় যে উক্ত গায়ক বা নায়কের মোহনীয় ক্ষমতা রয়েছে।

কর্তৃত্ব কী

What is authority

কর্তৃত্ব বলতে কোনো কাজ করার আইনানুগ ক্ষমতাকে বোঝায়। আসলে আইনানুগ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সমার্থক। কর্তৃত্বের বলেই একজন ব্যবস্থাপক তার অধীনস্থ কর্মীদেরকে আদেশ-নির্দেশ দিয়ে থাকেন। ব্যবস্থাপকেরা প্রতিষ্ঠানের নিকট থেকে আইনসিদ্ধ উপায়ে কর্তৃত্ব পেয়ে থাকেন। কর্তৃত্ব থাকার কারণেই একজন ব্যবস্থাপক বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করতে পারেন, কর্মীদের কার্যাবলি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং প্রতিষ্ঠানের যাবতীয় বিষয় দেখাশোনা করতে পারেন। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, প্রতিষ্ঠান কর্তৃক আইনানুগ উপায়ে প্রদত্ত ক্ষমতাই হলো কর্তৃত্ব।

ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আমরা যে কর্তৃত্বের কথা বলে থাকি তা হলো আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব (formal authority)। প্রতিষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক পদে (formal position) অধিষ্ঠিত হওয়ার কারণে এরূপ কর্তৃত্ব একজন ব্যবস্থাপক পেয়ে থাকেন।

কর্তৃত্বের বিভিন্ন তত্ত্ব

Different theories of authority

একজন ব্যবস্থাপক বিভিন্ন উৎস থেকে কর্তৃত্ব পেয়ে থাকেন। এ উৎসগুলোকে ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ একাধিক তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। এখানে কর্তৃত্বের উৎস সম্পর্কিত প্রচলিত দুটি তত্ত্ব আলোচনা করা হলো:

(১) ধ্রুপদি বা আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব (Classical or formal theory): কোনো ব্যক্তি যখন আমাদেরকে কোনো কাজ করার নির্দেশ দেন, তখন আমরা স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন করতে পারি- ''আমি কী করবো না করবো, এ ব্যাপার আপনি বলার কে? কোথা থেকে আপনি এ অধিকার পেয়েছেন?'' এ ধরনের প্রশ্ন এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, কোনো নির্দেশ পালন করার আগে আমরা নিশ্চিত হতে চাই যে নির্দেশদানকারী ব্যক্তির এরূপ নির্দেশ দেওয়ার আনুষ্ঠানিক অধিকার রয়েছে। একইভাবে প্রশ্ন ওঠতে পারে- প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকেরা কর্মীদের কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য নির্দেশ দেওয়ার অধিকার কোথা থেকে পেয়ে থাকেন? অর্থাৎ তাদের ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের উৎস কোথায়? এ প্রশ্নের জবাব দানের নিমিত্তে ''আনুষ্ঠানিক তত্ত্বের'' উদ্ভব হয়েছে। এ তত্ত্ব অনুযায়ী (যা ধ্রুপদি বা ক্লাসিক্যাল দৃষ্টিভঙ্গি (classical view) হিসেবেও পরিচিত) কর্তৃত্ব অনেক ওপরের পর্যায়ে সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে আইনানুগ পন্থায় নিচের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবাহিত হয় (lawfully passed down, from level to level)। এ তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী, প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের আইনগত নির্দেশ দেওয়ার অধিকার আছে এবং কর্মচারীরা এ নির্দেশ মানতে বাধ্য।

(২) কর্তৃত্বের গ্রহণীয়তা তত্ত্ব (Acceptance theory): আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বের উৎস সম্পর্কিত দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণীয়তা তত্ত্বের সাথে জড়িত। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, কর্তৃত্বের বিষয়টি কর্মীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়। এরূপ দৃষ্টিভঙ্গির মূল সূত্র কর্মীদের সাথে সম্পৃক্ত, ব্যবস্থাপকের সাথে নয়। কারণ আইনানুগ নির্দেশের অনেকগুলো সর্ব অবস্থায় কর্মীরা মান্য করে না। কিছু নির্দেশ তারা মান্য করলেও, কিছু নির্দেশ তারা বিশেষ অবস্থায় মান্য নাও করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, একজন সুপারভাইজার কারখানায় ঢুকেই যদি তার স্বরে হাঁকডাক দিতে থাকে-''তোমরা সবাই ঝিমিয়ে আছো কেন? ফাঁকিবাজি বন্ধ করে মন দিয়ে কাজ কর''- তখন শ্রমিকরা হয়তো সুপারভাইজারের এরূপ কথা বলার অধিকার নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু ক্ষোভের সাথে কিংবা উদাসীন মনে আদেশ পালনে বিরত থাকবে। ফলে সুপারভাইজারের কর্তৃত্বের বিষয়টি এখানে একেবারেই অর্থহীন, কেননা শ্রমিকরা সুপারভাইজারের আদেশটি গ্রহণ করেনি।

অবশ্য এর অর্থ এ নয় যে, প্রতিষ্ঠানে সব সময় বিশৃঙ্খলা লেগেই থাকবে। অধিকাংশ আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্ব কর্মীরা মেনে চলে। গ্রহণীয়তা তত্ত্বের অন্যতম সমার্থক চেস্টার বার্নার্ড (Chester Barnard) কতিপয় শর্তের কথা বলেছেন যেগুলো পরিপুরিত হলে একজন ব্যক্তি উচ্চপদে অধিষ্ঠিত নির্বাহীদের কর্তৃত্ব মেনে চলার জন্য অনুপ্রাণিত হয়: (ক) সে কর্তৃত্বের বিষয়টি বা আদেশটি বোঝতে পেরেছে; (খ) সে বিশ্বাস করে যে, আদেশটি প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্যের সাথে সংগতিপূর্ণ; (গ) সে আরও মনে করে যে, প্রদত্ত আদেশ সার্বিকভাবে তার ব্যক্তিগত স্বার্থের পরিপন্থী নয়; এবং (ঘ) সে আদেশ পালনে মানসিক ও শারীরিকভাবে সক্ষম।

কর্তৃত্ব অর্পণ

Delegation of authority

একটি প্রতিষ্ঠানের সাংগঠনিক কাঠামো সম্বন্ধে আপনি জেনেছেন। প্রতিষ্ঠানে অফিসিয়ালভাবে যে কাঠামো অনুমোদন করা হয় সেটিতে কর্তৃত্ব (authority) কীভাবে, কার কাছে, কী পরিমাণে অর্পণ (delegate) করা হয় সে বিষয়ে আপনার জানা দরকার। একজন ব্যবস্থাপক বা কর্মী কর্তৃত্ব বা ক্ষমতার বলেই নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে

কাজের চাপ বেশি থাকে; আর তাই সাধারণত উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপকেরা তাদের অধীনস্থ কর্মীদের নিকট কিছু কিছু কর্তৃত্ব 'হস্তান্তর' বা অর্পণ করেন। কর্তৃত্ব অর্পণ করে তারা কিছুটা ভারমুক্ত হয়ে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কাজে মনোনিবেশ করতে পারেন। উচ্চস্তরের ব্যবস্থাপক কর্তৃক অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীর নিকট কর্তৃত্ব হস্তান্তর করা হলে তাকে কর্তৃত্ব অর্পণ বলা হয়। যার নিকট কর্তৃত্ব অর্পিত হয় তিনিও প্রয়োজনবোধে কিছু পরিমাণ কর্তৃত্ব তার অধীনস্থ কর্মীর নিকট অর্পণ করতে পারেন। এভাবে প্রতিষ্ঠানের সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত কর্তৃত্ব অর্পিত হতে পারে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ব্যবস্থাপনা পরিচালক কিছু কর্তৃত্ব মহাব্যবস্থাপকের নিকট অর্পণ করলেন; মহাব্যবস্থাপক সে কর্তৃত্বের কিছুটা সহকারী মহাব্যবস্থাপকের নিকট অর্পণ করলেন। কাজের চাপ কমানোর জন্য সহকারী মহাব্যবস্থাপক কতিপয় কর্তৃত্ব তার অধীনস্থ দুজন বিভাগীয় ব্যবস্থাপকের নিকট অর্পণ করলেন। সর্বশেষে সুপারভাইজারগণ কিছু কিছু কর্তৃত্ব বিভাগীয় ব্যবস্থাপকদের নিকট থেকে পেলেন। এভাবে কর্তৃত্ব সংগঠনের বিভিন্ন স্তরে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ল।

এখানে একটি বিষয় খেয়াল করবেন- কোনো ব্যবস্থাপক তার ওপর অর্পিত কর্তৃত্ব অন্যের নিকট অর্পণ করতে পারলেও তিনি কিন্তু দায়িত্ব (responsibility) অর্পণ করতে পারেন না। তিনি যেটুকু কর্তৃত্ব অধীনস্থ কর্মীর নিকট অর্পণ করবেন সে কর্তৃত্বের সাথে সম্পর্কিত কাজের জন্য তিনি নিজেই তার উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট দায়ী থাকবেন। অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে সম্পাদিত না হলে তাকেই জবাবদিহি করতে হবে; তার অধীনস্থ কর্মীকে নয়। অবশ্য তিনি তার অধীনস্থ কর্মীকে তার নিকট অর্পিত কর্তৃত্বের জন্য দায়বদ্ধ করতে পারেন। এজন্যই বলা হয়- Delegation is the process by which an individual manager transfers part of his legitimate authority to a subordinate but without passing on the ultimate responsibility which has been entrusted to him by his own superior.

অধীনস্থ কর্মীর নিকট কর্তৃত্ব অর্পণ করার জন্য সাধারণত ছয়টি পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়: লক্ষ্য নির্ধারণ, কর্তৃত্ব সংজ্ঞায়িতকরণ ও নির্ধারিতকরণ, দায়বদ্ধতা বা জবাবদিহিতা নিরূপণ, নিয়ন্ত্রণ কৌশল নির্ধারণ, প্রশিক্ষণ প্রদান এবং অনুবর্তন।

অত্র গ্রন্থে আমরা 'কর্তৃত্ব অর্পণ' বিষয়টিকে 'ব্যবস্থাপনা ইস্যু' হিসেবে পর্যালোচনা করেছি। অর্থাৎ এখানে কর্তৃত্ব অর্পণ বলতে ব্যক্তি থেকে ব্যক্তির নিকট কর্তৃত্ব হস্তান্তরকে বোঝানো হবে। পক্ষান্তরে, সাংগঠনিক কাঠামোর দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কর্তৃত্ব অর্পণ বিষয়টির ওপর আমরা পরবর্তীতে আলোচনা করব। সাংগঠনিক কাঠামোর প্রেক্ষিতে কর্তৃত্ব একটি 'সাংগঠনিক ইস্যু' এবং তা কেন্দ্রীকরণ-বিকেন্দ্রীকরণ নামেই বেশি পরিচিত।

সারসংক্ষেপ

কোনো ব্যক্তি বা দলের মনোভাব বা আচরণকে প্রভাবিত করার শক্তিই হলো ক্ষমতা। যেখানেই বিভিন্ন ব্যক্তি বা দলের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক বিদ্যমান, সেখানেই ক্ষমতার বিষয়টি জড়িত। ক্ষমতার পাঁচটি উৎস রয়েছে: জবরদস্তিমূলক ক্ষমতা, পুরস্কার প্রদানের ক্ষমতা, আইনানুগ ক্ষমতা, বিশেষজ্ঞ ক্ষমতা এবং মোহনীয় ক্ষমতা। অন্যদিকে, কর্তৃত্ব বলতে কোনো কাজ করার আইনানুগ ক্ষমতাকে বোঝায়। একজন ব্যবস্থাপক বিভিন্ন উৎস থেকে কর্তৃত্ব পেয়ে থাকেন। এ উৎসগুলোকে ব্যবস্থাপনা বিশারদগণ একাধিক তত্ত্বের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করেছেন। যেমন- আনুষ্ঠানিক তত্ত্ব অনুযায়ী কর্তৃত্ব অনেক ওপরের পর্যায়ে সৃষ্টি হয় এবং সেখান থেকে আইনানুগ পন্থায় নিচের বিভিন্ন পর্যায়ে প্রবাহিত হয়। এ তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপকদের আইনগত নির্দেশ দেওয়ার অধিকার আছে এবং কর্মচারীরা এ নির্দেশ মানতে বাধ্য। আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বের উৎস সম্পর্কিত দ্বিতীয় দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণীয়তা তত্ত্বের সাথে জড়িত। এ তত্ত্ব অনুযায়ী, কর্তৃত্বের বিষয়টি কর্মীদের নিকট গ্রহণযোগ্যতার ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

পাঠ ৬.৭ ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ
Centralization and Decentralization of Power

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- কেন্দ্রীকরণ কী তা বলতে পারবেন।
- ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

একটি প্রতিষ্ঠানে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত কিংবা বিকেন্দ্রীভূত থাকতে পারে অথবা একই সাথে কিছু ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রেখে বাকি ক্ষমতা বিকেন্দ্রীভূত করে রাখা যেতে পারে। ক্ষমতার ব্যবহার কীভাবে করা হবে, তা প্রধানত প্রতিষ্ঠানের মালিক বা সর্বোচ্চ ব্যবস্থাপকদের ওপর নির্ভর করে। তারাই মূলত এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়। এ পাঠে আমরা ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণ নিয়ে আলোচনা করব।

কেন্দ্রীকরণ
Centralization

প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হলে তাকে কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ (centralization of authority) বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা বা অধিকাংশ ক্ষমতা উপরস্থ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে রেখে দেওয়া হলে বলা হয় যে, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। সাধারণত নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ করা হয়:

(ক) যখন ব্যবসায়িক পরিবেশ মোটামুটি ভাবে স্থিতিশীল থাকে;
(খ) যখন প্রতিষ্ঠানের প্রধান কার্যালয় থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার পলিসি গ্রহণ করা হয়;
(গ) যখন মালিক বা ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যবসায়ের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রে রেখে দেওয়ার বাসনা পোষণ করে;
(ঘ) যখন নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকেরা তেমন মেধাবী বা দক্ষ হয় না কিংবা তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশীদার হওয়ার ইচ্ছা রাখে না;
(ঙ) যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তসমূহ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়।

কেন্দ্রীকরণের উল্টোটা হলো বিকেন্দ্রীকরণ (decentralization)। চিত্র ৬.১১- এ বাম পাশে কেন্দ্রীকরণ ও ডান পাশে বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা দেখানো হয়েছে-

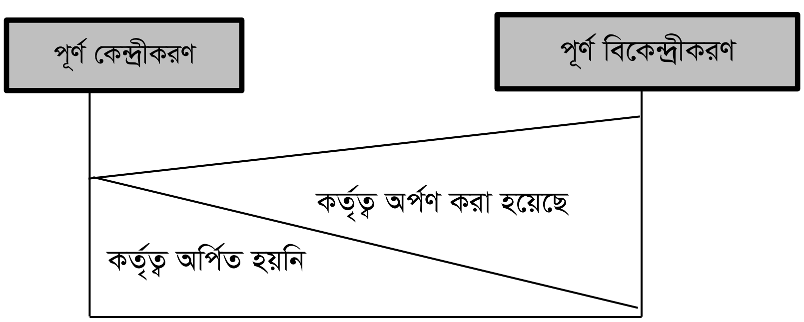

চিত্র ৬.১০: কেন্দ্রীকরণ ও বিকেন্দ্রীকরণের মাত্রা

বিকেন্দ্রীকরণ

Decentralization

প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব কয়েকজন কর্মকর্তার হাতে কেন্দ্রীভূত না রেখে তা নিম্নের স্তরগুলোতে অর্পণ (delegate) করে দেওয়া হলে তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। এক্ষেত্রে সব স্তরের কর্মকর্তাদের নিকট প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুযায়ী ক্ষমতা অর্পিত হয়। ক্ষমতা যত বেশি বিকেন্দ্রীভূত হয় প্রতিষ্ঠানের নিম্নের স্তরগুলোতে তত বেশি সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হয়। নিম্নোক্ত অবস্থায় ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করা যায়:

(ক) যখন ব্যবসায়িক পরিবেশ অস্থিতিশীল ও অনিশ্চিত থাকে;

(খ) যখন নিম্ন-স্তরের ব্যবস্থাপকরা মেধাবী ও দক্ষ হয় এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করার অভিলাষী হয়;

(গ) যখন গৃহীতব্য সিদ্ধান্তসমূহ তেমন গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয় না।

বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের কাজের ভার লাঘব হয়। কিছু কিছু কাজ যা তাদের না করলেও চলে, সেগুলো অধীনস্থদের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে নিজেরা ভারমুক্ত হতে পারেন। এর মাধ্যমে সব কর্মকর্তারাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণ করতে পারেন বিধায় নেতৃত্বের উন্নয়ন ঘটে। তাছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের কারণে কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও উৎসাহের সৃষ্টি হয়। তারা নিজ নিজ ভুবনে আপন সত্তা বজায় রেখে কাজ করে যেতে উৎসাহী হন।

সারসংক্ষেপ

প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরে কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা হলে তাকে কর্তৃত্বের কেন্দ্রীকরণ বলা হয়। প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ সংক্রান্ত যাবতীয় ক্ষমতা বা অধিকাংশ ক্ষমতা উপরস্থ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে রেখে দেওয়া হলে বলা হয় যে, ক্ষমতা কেন্দ্রীকরণ করা হয়েছে। অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ স্তরে ক্ষমতা বা কর্তৃত্ব কয়েকজন কর্মকর্তার হাতে কেন্দ্রীভূত না রেখে তা নিম্নের স্তরগুলোতে অর্পণ করে দেওয়া হলে তাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলা হয়। এক্ষেত্রে সব স্তরের কর্মকর্তাদের নিকট প্রয়োজন ও যোগ্যতা অনুযায়ী ক্ষমতা অর্পিত হয়।

পাঠ ৬.৮ তত্ত্বাবধান পরিসর
Span of Supervision

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- তত্ত্বাবধান পরিসর কী তা বলতে পারবেন।
- তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ণয় করতে পারবেন।
- বিভিন্ন প্রকার তত্ত্বাবধান পরিসরের বর্ণনা দিতে পারবেন।

সংগঠিতকরণ কার্যের একটি অন্যতম উপাদান হলো প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন পদের মধ্যে জবাবদিহিতার সম্পর্ক বা রিপোটিং-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। ধরুন, একটি মাঝারি ধরনের প্রতিষ্ঠানের মহাব্যবস্থাপক চারজন বিভাগীয় ব্যবস্থাপক নিয়োগ করেছেন। একজন কর্মী বিভাগের জন্য, একজন অর্থ বিভাগের জন্য, একজন উৎপাদন বিভাগের জন্য এবং একজন বিপণন বিভাগের জন্য। বিপণন ব্যবস্থাপক তার কাজের জন্য কী উৎপাদন ব্যবস্থাপকের নিকট জবাবদিহি করবে, নাকি কর্মী ব্যবস্থাপকের নিকট, নাকি অর্থ ব্যবস্থাপকের নিকট, নাকি মহাব্যবস্থাপকের নিকট? অন্যান্য ব্যবস্থাপকদের জন্যও একই প্রশ্ন। এসব প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত রয়েছে রিপোটিং-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সাথে সংশ্লিষ্ট মূল বিষয়গুলো, অর্থাৎ 'চেইন অব কমান্ড' এবং তত্ত্বাবধান পরিসর সুনির্দিষ্টভাবে নিরূপণ। এ পাঠে আমরা তত্ত্বাবধান পরিসর সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করব। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তত্ত্বাবধান পরিসর ব্যবস্থাপনা পরিসর (span of management) বা নিয়ন্ত্রণ পরিসর (span of control) নামেও পরিচিত।

তত্ত্বাবধান পরিসরের অর্থ
Meaning of span of supervision

একজন নির্বাহী (executive) বা সুপারভাইজর অনেক কর্মীর কাজকর্ম তদারক করে থাকেন। এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো-একজন নির্বাহী সর্বোচ্চ কত জনের কাজ সুষ্ঠুভাবে তদারক করতে পারেন? এ প্রশ্নের উত্তর সহজ নয়। তবে এ প্রশ্নের সাথেই সম্পর্কিত তত্ত্বাবধান পরিসরের বিষয়টি।

তত্ত্বাবধান পরিসর বলতে একজন নির্বাহী কর্তৃক তত্ত্বাবধানকৃত অধীনস্থ কর্মীদের সংখ্যাকে বোঝায়। নির্বাহী দক্ষতার সাথে যে কয়জন অধস্তন কর্মীকে তদারক করতে পারেন সেটিই হলো তার তত্ত্বাবধান পরিসর। এ পরিসর সর্বদাই এমন হওয়া উচিত যা ছোটোও নয়, বড়োও নয়। অর্থাৎ তত্ত্বাবধান পরিসর কাম্য (optimum) হওয়া বাঞ্ছনীয়। কারণ তত্ত্বাবধান পরিসর বড়ো হলে নির্বাহীর পক্ষে সবাইকে ঠিকভাবে তত্ত্বাবধান করা সম্ভব হয় না। এতে প্রতিষ্ঠানে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। আবার, পরিসর বেশি ছোটো হলে অধিক সংখ্যক নির্বাহীর প্রয়োজন হবে এবং খরচও বেড়ে যাবে। তত্ত্বাবধান পরিসর ছোটো হলে প্রতিষ্ঠানে 'স্তরের' (levels) সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে। আর, পরিসর বড়ো হলে স্তরের সংখ্যা কম হবে।

তত্ত্বাবধান পরিসর নির্ণয়করণ: এ.ভি গ্রেইকুনাস (A.V. Graicunas) ১৯৩৩ সালে একটি নিবন্ধে তত্ত্বাবধান পরিসর হিসাব করার জন্য একটি ফর্মুলা দিয়েছিলেন। তার এ নিবন্ধটি International Institute of Management- এর ৭ই মার্চের (১৯৩৩) বুলেটিনে প্রকাশিত হয়েছিল।
তার ফর্মুলাটি ছিল নিম্নরূপ:

$$I = N\left(\frac{2N}{2} + N - 1\right)$$

এখানে, I = অধস্তন কর্মীদের সঙ্গে নির্বাহীর এবং কর্মীদের নিজেদের মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক বা মিথস্ক্রিয়ার মোট সংখ্যা (total number of interactions with and among subordinates)।
N = অধস্তন কর্মীদের সংখ্যা (number of subordinates)।

এ ফর্মুলা অনুযায়ী হিসাব করলে দেখা যাবেঃ যদি একজন নির্বাহীর শুধু দুজন অধস্তন কর্মী থাকে, তাহলে মোট মিথস্ক্রিয়ার (interactions) সংখ্যা হবে ৬; অধস্তনের সংখ্যা তিন হলে মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা হবে ১৮; এবং অধস্তনের সংখ্যা ৫ হলে মিথস্ক্রিয়ার সংখ্যা হবে ১০০। এতে দেখা যাচ্ছে যে, অধস্তনের সংখ্যা একজন করে বাড়লেও আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা যথেষ্ট বেড়ে যায়। গ্রেইকুনাস অবশ্য কাম্য পরিসর বা N - এর আদর্শ মান কত হবে সে সম্পর্কে কিছু বলেননি। তার ফর্মুলা থেকে আমরা আন্তঃসম্পর্কের জটিলতা সম্পর্কে জানতে পারি। কাম্য সংখ্যা কত হবে সে সম্বন্ধে নির্বাহীকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

তত্ত্বাবধান পরিসরের প্রকারভেদ

Types of span of supervision

তত্ত্বাবধান পরিসরকে তত্ত্বাবধিত (supervised) অধস্তনের সংখ্যার ভিত্তিতে কিংবা ব্যবস্থাপনার স্তরের ভিত্তিতে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়ঃ

(১) অধস্তন কর্মীর সংখ্যার ভিত্তিতে তত্ত্বাবধান পরিসর
- (ক) সংকীর্ণ পরিসর (Narrow Span)
- (খ) বিস্তৃত পরিসর (Wide Span)

(২) ব্যবস্থাপনার স্তরের ভিত্তিতে তত্ত্বাবধান পরিসর
- (ক) অপারেটিভ পরিসর (Operative Span)
- (খ) এক্সিকিউটিভ পরিসর (Executive Span)

আসুন এ চার ধরনের তত্ত্বাবধান সম্পর্কে জেনে নেই।

সংকীর্ণ তত্ত্বাবধান পরিসর (Narrow span of supervision): সাধারণত, একজন নির্বাহীর অধীনস্থ কর্মীর সংখ্যা স্বল্প হলে তত্ত্বাবধান পরিসর সংকীর্ণ হয়। তবে তত্ত্বাবধান করতে হবে এমন কর্মীর সংখ্যা কত হলে তাকে সংকীর্ণ পরিসর বলা যাবে, এমন কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা কেউ দেয়নি। এটি স্থান-কাল-পাত্রের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। কোনো নির্বাহীর ক্ষেত্রে হয়তো ১০ জন অধস্তন কর্মীকে 'সংকীর্ণ পরিসর' হিসেবে আখ্যায়িত করা যাবে; কিন্তু অন্য একজনের ক্ষেত্রে হয়তো ৫ জনের বেশি হলে তাকে সংকীর্ণ পরিসর বলা যাবে না।

বিস্তৃত তত্ত্বাবধান পরিসর (Wide span of supervision): সাধারণভাবে বলা যায় যে, একজন নির্বাহীর অধীনস্থ কর্মীর সংখ্যা বেশি হলে তার তত্ত্বাবধান পরিসর 'বিস্তৃত পরিসর' হিসেবে আখ্যায়িত হবে। তবে 'বেশি' বলতে কত সংখ্যাকে বোঝাবে তৎসম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট নিয়ম প্রচলিত নেই। এটিও পরিস্থিতি-পরিবেশের ওপর নির্ভরশীল।

অপারেটিভ ও এক্সিকিউটিভ পরিসর (Operative and executive spans): রাল্‌ফ সি. ডেভিস (Ralph C. Davis) নামে একজন গ্রন্থকার দুই প্রকার পরিসরের কথা উল্লেখ করেছেনঃ একটি হলো অপারেটিভ পরিসর এবং অন্যটি এক্সিকিউটিভ পরিসর। প্রথমটি নিম্নস্তরের ব্যবস্থাপকদের জন্য প্রযোজ্য এবং দ্বিতীয়টি মধ্যম ও উচ্চ-পর্যায়ের ব্যবস্থাপকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। তিনি যুক্তি দেখিয়েছিলেন যে. অপারেটিভ পরিসর ৩০ জন পর্যন্ত হতে পারে এবং এক্সিকিউটিভ পরিসর ৩ থেকে ৯-এর মধ্যে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের কাজের ধরন, প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধির হার এবং অনুরূপ বিষয়াদি বিবেচনা করতে হবে। অবশ্য লিন্ডাল ইউরিক (Lyndall Urwick) এবং জেনারেল আয়ান হ্যামিল্টন (General Ian Hamilton) এক্সিকিউটিভ পরিসরের সংখ্যা ৬ জনে সীমিত রাখার পরামর্শ দিয়েছেন।

আমেরিকার সিয়ার্স রুবাক কোম্পানি (Sears Roebuck & Co.)- তে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা যায়, বিস্তৃত পরিসর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের মনোবল ও উৎপাদনশীলতা বেশি। গবেষকরা আরও যুক্তি দেখিয়েছেন যে, সংকীর্ণ পরিসরের কারণে যে 'লম্ব সাংগঠনিক কাঠামো' (tall structure)- এর উদ্ভব হয়, তা ব্যয়সাধ্য (বেশি সংখ্যক ব্যবস্থাপক

থাকার কারণে) এবং এতে যোগাযোগ সমস্যারও সৃষ্টি হয় (বেশি সংখ্যক লোকের মাধ্যমে তথ্য প্রবাহিত হওয়ার কারণে)। অনেক বিশেষজ্ঞ মত পোষণ করেন যে, স্বল্প স্তর বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠান (বিস্তৃত তত্ত্বাবধান পরিসর) অধিক দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে। এ যুক্তির ভিত্তিতে ফ্রাংকলিন মিন্ট কোম্পানি সম্প্রতি ব্যবস্থাপনার স্তর ৬ থেকে ৪- এ হ্রাস করেছেন এবং কোম্পানির প্রধান নির্বাহীর স্টিওয়ার্ট রেসনিক তার তত্ত্বাবধান পরিসর ৬ থেকে ১২-তে উন্নীত করেছেন। অনুরূপভাবে আইবিএম কোম্পানিও অনেকগুলো ব্যবস্থাপনার স্তর তুলে দিয়েছে। এ প্রবণতার মূল কারণ হলো, স্বল্পসংখ্যক ব্যবস্থাপনা স্তরের কারণে যোগযোগ প্রবাহ সাবলীল হয় এবং ব্যবস্থাপকেরা অধিক সংখ্যক কর্মীর সাথে ব্যক্তিগত যোগযোগ গড়ে তুলে সহজে প্রাতিষ্ঠানিক সমস্যার সমাধান করতে পারেন।

এখানে মনে রাখা দরকার, কোনো প্রতিষ্ঠানে তত্ত্বাবধান পরিসর ছোটো রাখা হলে যেমন কিছু কিছু সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে, ঠিক তেমনি বড়ো হলেও জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। তাই তত্ত্বাবধান পরিসর কাম্য পর্যায়ে (optimum) রাখাই যুক্তিসংগত। তত্ত্বাবধান পরিসর ছোটো রাখা হলে নির্বাহীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং তারই ফলশ্রুতিতে তদারকির স্তরও (levels of supervision) বৃদ্ধি পায়। এ কারণে নির্বাহীর সংখ্যা বৃদ্ধির বিপক্ষে বিভিন্নজন বিভিন্ন প্রকার যুক্তি দেখিয়ে থাকেন।

প্রতিষ্ঠানের সংগঠিতকরণ সম্পর্কে আমরা জানলাম। প্রতিষ্ঠানের সম্পদগুলোকে ফলপ্রসূভাবে সংগঠিতকরণ করা হয় প্রাতিষ্ঠানিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এ সম্পদকে কীভাবে পরিচালনা করা হবে? কে দেবেন নির্দেশনা? প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক নাকি ব্যবস্থাপকের পাশাপাশি অন্য কেউ কর্মীদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে? সঠিক পরিচালনা বা নির্দেশনা বা নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠানকে লক্ষ্যার্জনে এগিয়ে নিয়ে যায়। আবার, সঠিক ও পর্যাপ্ত পরিচালনার বা নেতৃত্বের অভাবে প্রতিষ্ঠান দিক-হারা নৌকার মত গন্তব্যহীন অবস্থায় চলতে চলতে এক সময় বিপর্যস্ত হয়ে যেতে পারে। এ সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়। পরের ইউনিটে আমরা নেতৃত্ব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

সারসংক্ষেপ

একজন নির্বাহী বা সুপারভাইজর অনেক কর্মীর কাজকর্ম তদারক করে থাকেন। তত্ত্বাবধান পরিসর বলতে একজন নির্বাহী কর্তৃক তত্ত্বাবধানকৃত অধীনস্থ কর্মীদের সংখ্যাকে বোঝায়। নির্বাহী দক্ষতার সাথে যে কয়জন অধস্তন কর্মীকে তদারক করতে পারেন সেটিই হলো তার তত্ত্বাবধান পরিসর। এ পরিসর সর্বদাই এমন হওয়া উচিত যা ছোটোও নয়, বড়োও নয়। তত্ত্বাবধান পরিসরকে তত্ত্বাবধিত অধস্তনের সংখ্যার ভিত্তিতে কিংবা ব্যবস্থাপনার স্তরের ভিত্তিতে চার ধরনের হয়ে থাকে, যেমন- সংকীর্ণ পরিসর, বিস্তৃত পরিসর, অপারেটিভ পরিসর এবং এক্সিকিউটিভ পরিসর। সাধারণত, একজন নির্বাহীর অধীনস্থ কর্মীর সংখ্যা স্বল্প হলে তত্ত্বাবধান পরিসর সংকীর্ণ হয়। একজন নির্বাহীর অধীনস্থ কর্মীর সংখ্যা বেশি হলে তার তত্ত্বাবধান পরিসর 'বিস্তৃত পরিসর' হিসেবে আখ্যায়িত হবে। অপারেটিভ পরিসর ৩০ জন পর্যন্ত হতে পারে এবং এক্সিকিউটিভ পরিসর ৩ থেকে ৯-এর মধ্যে সীমিত রাখা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে ব্যবস্থাপকের কাজের ধরন, প্রতিষ্ঠানের প্রবৃদ্ধির হার এবং অনুরূপ বিষয়াদি বিবেচনা করতে হয়।

ইউনিট মূল্যায়ন

১. সংগঠিতকরণ (বা সংগঠন) বলতে কী বোঝায়? বিভিন্ন গ্রন্থকারের দেওয়া সংজ্ঞার আলোকে আপনি সংগঠিতকরণের নিজস্ব ব্যাখ্যা দিন।
২. “সংগঠন হলো কোনো ব্যাপারে অংশগ্রহণকারী সকলের আচরণের সমষ্টি” উক্তিটির আলোকে সংগঠনের প্রকৃতি আলোচনা করুন।
৩. ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান সংগঠিতকরণের সাথে সংশ্লিষ্ট মৌলিক ধারণাগুলো কী কী? এগুলোর বিবরণ দিন।
৪. আনুষ্ঠানিক সংগঠন বলতে কী বোঝায়? অনানুষ্ঠানিক সংগঠনের সাথে আনুষ্ঠানিক সংগঠনের কী পার্থক্য রয়েছে?
৫. সাংগঠনিক ডিজাইন বলতে কী বোঝায়? সাংগঠনিক ডিজাইনের বিভিন্ন এ্যাপ্রোচ বর্ননা করুন।
৬. মেকানিস্টিক সাংগঠনিক ডিজাইন ও অরগ্যানিক সাংগঠনিক ডিজাইনের মধ্যে পার্থক্য নিরূপন করুন।
৭. সাংগঠনিক কাঠামো বলতে কী বোঝায়? সংগঠন চার্ট এবং সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে পার্থক্য কী?
৮. সরলরৈখিক সংগঠন কী? এরূপ সংগঠনের সুবিধা ও অসুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।
৯. মেট্রিক্স সাংগঠনিক কাঠামো (বা মেট্রিক্স সংগঠন) কী? কোন ধরনের প্রতিষ্ঠানের জন্য এরূপ কাঠামো উপযুক্ত? চিত্রের মাধ্যমে একটি মেট্রিক্স সাংগঠনিক কাঠামো দেখান।
১০. কোন অবস্থায় এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থায় প্রশাসনিক ব্যবস্থা হিসেবে আপনি দল কাঠামো ব্যবহার করার পরামর্শ দিবেন? আপনি এরূপ দলের কার্যকর পরিচালনা নিশ্চিত করবেন কীভাবে?
১১. ‘‘ব্যবস্থাপনার ত্রুটিসমূহ নিরসনের জন্য দল কাঠামো মহৌষধ নয়, তবে সঠিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তা খুবই প্রয়োজনীয়।’’ এ উক্তিটি আলোচনা করুন।
১২. বিভাগীকরণ বলতে কী বোঝেন? বিভাগীকরণ কেন করা হয়?
১৩. বিভাগীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলো কী? সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।
১৪. চিত্রসহকারে পণ্যভিত্তিক ও কার্যভিত্তিক বিভাগীকরণ ব্যাখ্যা করুন। কোন কোন ক্ষেত্রে এ দুটি বিভাগীকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়?
১৫. আমেরিকান গবেষক জন ফ্রেঞ্চ ও বার্ট্রাম র‌্যাভেন ক্ষমতা সম্পর্কিত যে পাঁচটি ভিত্তি সনাক্ত করেছেন সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করুন।
১৬. আইনানুগ ক্ষমতাকে আনুষ্ঠানিক ক্ষমতাও বলা হয় কেন?
১৭. সংকীর্ণ ও বিস্তৃত তত্ত্বাবধান পরিসরের মধ্যে পার্থক্য কী কী? আলোচনা করুন।
১৮. কেন তত্ত্ববধান পরিসর কাম্যস্তরে থাকা বাঞ্ছনীয়?